পরিবারে ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে সতর্ক থাকতে হবে
— পৃঃ ২৪

দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বাংলাদেশের হিন্দুদের সাংবিধানিক পরিচয় নিশ্চিহ্ন হবার মুখে
— পৃঃ ১৫

৭৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ৮ নভেম্বর, ২০২১।। ২১ কার্তিক- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

ক্যানসার-আতঙ্ক ও সচেতনতা

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ২১ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৮ নভেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘কংগ্রেস মুক্ত’ ভারত চেয়ে ‘ভিক্ষাং দেহি’ মমতা
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

রাজীব খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

মধ্যস্বত্বভোগী ও মধ্যপন্থার সংঘর্ষ ও সমাধান
◻ জয়তীর্থ রাও ◻ ৮

বাংলাদেশের হিন্দু নিধন এবং এ দেশের সেকুলারবাদীরা
◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

ভারতে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার
◻ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ◻ ১১

মোপলাদের বর্বরতাকে বামপন্থীরা চেপে রাখতে চায়
◻ রামমাধব ◻ ১৩

প্রধানমন্ত্রী হবার দিবাস্বপ্ন দেখছেন মাননীয়া
◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ১৪

বাংলাদেশের হিন্দুদের সাংবিধানিক পরিচয় নিশ্চিহ্ন হবার মুখে
◻ আনন্দ দেবশর্মা ◻ ১৫

বিমুক্তির পথের দিশারি আমীরচাঁদ অমৃতলোকে
◻ তিলক সেনগুপ্ত ◻ ১৭

ক্যানসারের প্রধান কারণ কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি
◻ রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৩

পরিবারে ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে সতর্ক থাকতে হবে
◻ ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায় ◻ ২৪

ফুসফুসের ক্যানসার কী এবং এ থেকে বাঁচার উপায়
◻ ডাঃ উচ্ছল কুমার ভদ্র ◻ ২৬

আমার কি ক্যানসার হয়েছে ডাক্তারবাবু ◻ অনন্যা চক্রবর্তী ◻ ২৯

বিদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লালা হরদয়াল
◻ কৌশিক রায় ◻ ৩১

ভাগীরথীর গ্রাসে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ
◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৩৩

তিন শতাধিক বছরের প্রাচীন যাদুয়ামাতার মন্দির
◻ সপ্তর্ষি ঘোষ ◻ ৩৫

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের আধ্যাত্মিকতা ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৬

আমেরিকা আফগানিস্তানে হারেনি, হেরেছে আফগান জনগণ
◻ শিতাংশু গুহ ◻ ৪৩

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে ক্যানসার রোগের চিকিৎসা
◻ ডাঃ নূপুর বিশ্বাস ◻ ৪৪

অসমের দিসপুর দখলের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি বঙ্গীয় মূলের মুসলিমদের
◻ রাজু সরখেল ◻ ৪৬

ভারতের সমাজতন্ত্রের দুই পথিকৃত ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২
◻ সমাবেশ সমাচার : ৩৮ ◻ রঙ্গম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১
◻ চিত্রকথা ◻ ৪৯ ◻ রাশিফল ◻ ৫০

প্রকাশিত হবে
১৫ নভেম্বর
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৫ নভেম্বর
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সত্যান্বেষী

আমাদের দেশে চিত্রতারকাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ শোনা গেলে সারা দেশের মিডিয়া রে-রে করে তেড়ে আসে। মিডিয়ার অতিসক্রিয়তা আমরা নাসিরুদ্দিন শাহ, জাভেদ আখতার ও দীপিকা পাড়ুকোনের ক্ষেত্রে দেখেছি। সম্প্রতি দেখলাম শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খানের ক্ষেত্রেও। আরিয়ান খানকে মাদকাসক্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার করেছেন এনসিবি-র অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সমীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশের মিডিয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলি। উদ্দেশ্য, সমীরকে বলির পাঁঠা বানিয়ে মুসলমান তোষণ করা। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা সমীর ওয়াংখেড়ে এবং তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া ঘোলাজলের রাজনীতি নিয়ে। লিখবেন হীরক কর, দেবযানী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from :

A
Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ক্যানসার সচেতনতা দিবসের অঙ্গীকার

ইদানীং ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলিতেছেন ‘ক্যানসার হ্যাজ নো অ্যানসার’কে এখন শুধু প্রতিহত নয়, নির্মূল করাও হইতেছে। ক্যানসারের লক্ষণ আগেভাগে শনাক্ত করিয়া, পরীক্ষায় প্রমাণ করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা চলিতেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ক্যানসারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ৪ ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব ক্যানসার দিবসের সূচনা হইয়াছিল এবং এই একই উদ্দেশ্যে ৭ নভেম্বর দিনটি আমাদের দেশে উদ্‌যাপিত হয়। প্যারিসে সমগ্র বিশ্বের ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা রোগ নির্ণয় ও উপাচারের বিভিন্ন পদ্ধতির গবেষণা ও উদ্ভাবনের নিমিত্ত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তৎকালীন ফরাসি রাষ্ট্রপতি জ্যাক চিরাগ ও ইউনেস্কোর সভাপতি জাপানি কূটনীতিবিদ কৈসিরো মাতসুরার উপস্থিতিতে এক বিধিবিধানের প্রণয়ন করা হয়। ক্যানসার আক্রান্তদের মনোবল বৃদ্ধি করিবার জন্য ওইদিন মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মানুষ ‘আমি আছি এবং থাকিব’ স্লোগান দিয়া পথপরিক্রমা করে। এখন ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে এই অভিযান চালানো হইতেছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, প্রদেশ, দেশ হইতে বিদেশের মাটিতে প্রবল করা চলিতেছে এই অভিযানকে। ক্যানসার রোগীর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছাড়ও ডাক্তার, নার্স, গবেষক, নীতি নির্ধারক রাজনেতা হইতে চলচ্চিত্রের অভিনেতা এবং দেশ বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শামিল হইতেছেন এই অভিযানে। সৌভাগ্যের বিষয়, আন্তর্জাতিক ক্যানসার নিরোধক কমিটি (ইউআইসিসি)-র সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন ভারতের ডাঃ অনিল দ্য ক্রুজ এবং সতেরোজনের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য হইয়াছেন মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল ক্যানসার হসপিটালের স্বনামধন্য শল্য চিকিৎসক অধ্যাপক চন্দ্রশেখর প্রমেশ। এই আন্তর্জাতিক সমিতির সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে ১৭২টি দেশের ২০০০ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

সারা বিশ্বে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ ক্যানসার রোগীর মৃত্যু হয়। ভারতে মহিলাদের স্তন ও জরায়ু এবং পুরুষদের মুখগহ্বর, ফুসফুস, পাকস্থলী ও খাদ্যনালীর ক্যানসারই প্রধান। পাশ্চাত্য দেশের মহিলারা জরায়ুর প্যাপ স্মিয়ার ও স্তনের ম্যামোগ্রামের যে সুবিধা পান , উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশের মানুষ সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দেহের রোগ প্রতিষেধক তন্তুগুলি ক্যানসার কোষগুলিকে প্রতিহত করিতে পারে না। তাহা ছাড়া গুটকা, বিড়ি-সিগারেটের তামাক, পরিবেশ দূষণ, বংশগতি, খাদ্য ও পানীয় জলের প্রদূষণ, ইলেক্ট্রো- ম্যাগ্নেটিক রেডিয়েশন এবং বিভিন্ন জীবাণু ও হরমোনের প্রভাবে ক্যানসার সৃষ্টি হয়। ক্যানসার প্রতিরোধে খাদ্যভ্যাস, জীবনশৈলীর পরিবর্তন, স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজন। আমাদের বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক স্তরে টি এন এমের শ্রেণীবিন্যাস, গবেষণামূলক পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, পরিবেশগত ঝুঁকির অনুসন্ধান, নূতন ও পুরাতন উপাচারগুলির তুলনামূলক বিচার, সার্জারি, কেমো বা রেডিয়েশনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের অত্যাধুনিক স্টেমলে, জিন ও মোনোক্রোনাল অ্যান্টিবডি থেরাপি করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ক্যানসার রোগীর পুনর্বাসন ও বহুমাত্রিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাহাদের দৈনন্দিন জীবন বহু পরিমাণে সহজ ও সুখকর হইয়াছে।

বিশ্ব ক্যানসার দিবসের ঘোষণা হউক — বিশ্ববাসীকে হেপাটাইটিস-বি এবং এইচপিভি-র ভ্যাকসিন দিয়া যকৃৎ ও জরায়ুর ক্যানসার প্রতিহত করা; প্রতিটি দেশে ক্যানসার বিশেষজ্ঞের সংখ্যা, পঠনপাঠন ও শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আনা; ক্যানসারের ব্যথার ঔষধ সুলভ করা; ক্যানসার বিষয়ক অজস্র ভ্রান্ত ও অমূক ধারণাকে নিবারণ করা; ক্যানসার হাসপাতাল ও হসপিসের সংখ্যা জনসংখ্যা অনুপাতে বৃদ্ধি করা; আধুনিক ল্যাবরেটরি ও রেডিয়োলজির সংখ্যার সঙ্গে গুণগত মানেরও উন্নতি করা; প্যাথলজিস্ট, রেডিয়োলজিস্ট ও টেকনিশিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণর ব্যবস্থা করা এবং করোনার মতো ক্যানসারকেও আন্তর্জাতিক স্তরে আনা যাহাতে প্রতিটি রোগীই সমগ্র বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে।

সুভাষিতম্

কৃতে প্রতিকৃতিং কুর্যাদ্ হিংসিতে প্রতিহিংসিতম্।

তত্র দোষো ন পশ্যামি দুষ্টে দুষ্টং সমাচরেৎ।। (চাণক্যনীতি)

যে যেরকম ব্যবহার করে তার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করাই উচিত। হিংসুটের প্রতি হিংসা করাই উচিত। এতে কোনো দোষ নেই। দুষ্টের সঙ্গে দুষ্টতা করাই সমীচীন।

'কংগ্রেস মুক্ত' ভারত চেয়ে 'ভিক্ষাং দেহি' মমতা

দশ বছর ধরে ছুরির ভুল দিকে শান দিতে দিতে ভোঁতা করে ফেলেছেন অনেক বঙ্গ সাংবাদিক। কেউ কেউ মমতার ক্ষমতাকে মান্যতা দিতে গিয়ে মানমর্যাদাও খুইয়ে বসে রয়েছেন।

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ভারত পরিক্রমায় বেরিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্লোগান 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি'। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মস্করা করে বলছেন 'ব-কলমে বিজেপি-রই কাজ করছেন মমতা'। যদিও আমি সে যুক্তি মানি না। এটা সত্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় বিভিন্ন রাজ্যের দরজায় ঘুরছেন। গোয়া ও ত্রিপুরায় কড়া নেড়ে জল মাপতে উত্তরপ্রদেশ যাবেন মমতা।

তাঁর কর্মসূচি : 'বিজেপি-নয়'। 'কংগ্রেস হটাও'। সে বোঝা নামাতে মরিয়া মমতা।

তাঁর কল্পনা : নরেন্দ্র মোদী সর্বস্ব বিজেপির এখন পড়ন্ত বেলা। কংগ্রেসকেই তাই বিজেপির 'বি-টিম' ঠাউরে এগোতে হবে।

তাঁর মত : কংগ্রেসের দুর্বলতার সুযোগেই বিজেপির বাড়বাড়ন্ত। তাই কংগ্রেসই প্রধান শত্রু। আসল টার্গেট। দলীয় মুখপত্রে কংগ্রেসকে পচা ডোবা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কংগ্রেসকে শেষ করে তবেই বিজেপির সঙ্গে লড়বে তৃণমূল। মানতে কষ্ট হলেও ক্ষমা-ঘেন্না করে তৃণমূল এখন সর্বভারতীয় দল।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির বিরুদ্ধে একক লড়াইয়ে তৃণমূলের থেকে অনেকটাই এগিয়ে কংগ্রেস। ২০১৯-এ বিজেপির বিরুদ্ধে ২০৪ আসনে লড়ে কংগ্রেস। জেতে মাত্র ৬ আসন। সে তুলনায় তৃণমূলের অবস্থা ভালো। বিজেপিকে হারিয়ে রাজ্যে তারা ২২ আসন পায়। জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস ভোট পায় ২০ শতাংশ। ২০২৪-এর আগে পাঁচমারি ও সিমলার মতোন চিন্তন শিবির ডেকে নিজেদের সাফসুতরো করতে চাইছে কংগ্রেস।

বিজেপির এক নেতা হেসে বললেন, 'মমতার সফর গোয়া নয়। গয়া হবে। উনি গয়া, কাশী, বারাণসী তীর্থ করছেন। ওই পুণ্য পিঁপড়ে খাবে।' তৃণমূলের দাবি ২০২৪-এর আগেই ১০ রাজ্যে শক্তি বাড়াবে দল। এদিকে 'মমতার গদ্দারে' ভরে উঠছে তৃণমূল। তার শেষ এন্ট্রি রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৬ সালে সিপিএম নেতা জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী হতে গিয়েও সব ভেস্তে দেয় তাঁর দল। সে সময় ১৬টি রাজনৈতিক দল তাঁকে সমর্থন করে। হবু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মমতাকে এখনো কেউ সমর্থন করেনি।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেছিলেন ভুল করে সমুদ্রের জল মাপতে গিয়ে কীভাবে নুনের পুতুল গলে যায়। সংসদে ৪ শতাংশ ক্ষমতা নিয়ে বিজেপির ৪২ শতাংশের সমুদ্রে মমতা যে ডুবে যাবেন এখন অবধি তা নিশ্চিত। মমতার জন্মদাতা কংগ্রেস। কংগ্রেসের এখন বেহাল অবস্থা। তার সঙ্গে জোট করা আর 'ফুটো ব্যাগে পয়সা রাখা' সমার্থক। চতুর রাজনীতিক মমতা তা জানেন। তাঁর কর্মসূচিতে আচমকা গোল সেধেছেন তাঁর নির্বাচনী বুদ্ধিদাতা ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। হঠাৎ করে সত্যটা জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন আগামী ৪০ বছর বিজেপি ভারতের রাজনৈতিক সত্য। বেকায়দায় পড়ে তার অন্য ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন মমতা। তাতেই আগুনে ঘি পড়েছে।

দশ বছর ধরে ছুরির ভুল দিকে শান দিতে দিতে ভোঁতা করে ফেলেছেন অনেক বঙ্গ সাংবাদিক। কেউ কেউ মমতার ক্ষমতাকে মান্যতা দিতে গিয়ে মানমর্যাদাও খুইয়ে বসে রয়েছেন। তাদের নতুন ঘুড়ি 'বাংলা'কে 'ভারত' বানিয়ে মমতাকে দিল্লির মসনদে পৌঁছে দেওয়া।

একসময় এ রাজ্যের বামপন্থীরা হাস্যকর স্লোগান দিতেন— 'লাল কিল্লা পর লাল নিশান। বাংলা হ্যায় এক হিন্দুস্তান।' ১৯৫২-র পর থেকে কোনো লোকসভা ভোটে তারা ১০ শতাংশের বেশি ভোট পাননি। আজ তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে জীবাশ্মে পরিণত হয়েছেন।

সংগঠিত সিপিএম নুনের পুতুল হয়ে গলে গিয়েছে। মমতা সর্বস্ব 'একমুখী' তৃণমূলের দশাও কি তাই হবে? মায়াবতী, জয়ললিতার উদাহরণ তো রয়েই গিয়েছে। তবে কিছুটা তফাতও রয়েছে। সেটা কী? তাই দেখার। ▫

রাজীব খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

মাননীয় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল ভবন, কলকাতা
রাজীববাবু,

আপনার ঠিকানা জানা নেই। আসলে আপনি যেভাবে ঠিকানা বদল করেন তাতে মনে রাখাও কঠিন। আপনি এক সময়ে বলেছিলেন আদর্শের জন্য বিজেপি করতে এসেছেন। তৃণমূলে কোনও আদর্শ নেই। এখন আবার ঠিক উল্টোটা বলছেন। আপনি সত্যি করেই তৃণমূল। যে তৃণমূল স্বার্থের জন্য বিজেপি, কংগ্রেস সবার হাত ধরতে পারে সেই দলেরই আপনি যোগ্য নেতা। যেমন মুকুল রায়।

এই চিঠি লেখার সময়ে মনে পড়ছে আপনার কথাগুলো। অভিমানে, জেদে তৃণমূল ছেড়ে ভুল করেছিলেন, এজন্য নাকি আপনি অনুতপ্তও। আপনাকে দলে নিতে তৃণমূলও ভয় পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সাহস করেনি। দলে নিতে বিমানে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে এক বিজেপি শাসিত রাজ্য ত্রিপুরায়। পশ্চিমবঙ্গে হলে নাকি বেদম গোলমাল হতে পারত। ত্রিপুরায় গিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়ে আপনি অনেক অনুতাপের কথা শোনালেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। আগরতলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পুরনো দলের নতুন পতাকা নিয়ে বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝিয়ে বিজেপিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি ভোটের সময় ওদের সভা থেকেই বলেছিলাম, ব্যক্তিগত আক্রমণ কখনওই মানুষ ভালো ভাবে মেনে নেবে না। তাই হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঠিক, তা বাঙ্গলার মানুষ তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। আর আমি এবং আমরা যে ভুল ছিলাম, তাও প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।'

যাক একটু হলেও স্বীকার করেছেন যে আপনি ভুল ছিলেন। কিন্তু একবারও বললেন না তো যে আপনি ছেলেমানুষ ছিলেন। তাই বিজেপি আপনাকে যা যা ভুল বুঝিয়েছে তাই বুঝেছেন। কচি খোকার মতো আপনি দমবন্ধ লাগার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমি জানি, দল বদলে যাঁরা ক্ষমতার মধু খেতে বিজেপিতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আপনি ধূর্ততম ব্যক্তি। মনে আছে তো, যেদিন আপনি তৃণমূলে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি হাতে শেষবার বিধানসভা থেকে বেরিয়েছিলেন। তখনই ভেবে রেখেছিলেন পরের কথা। লাগলে তুক, না লাগলে তাক। ভেবেছিলেন বিজেপি বিধায়ক হয়ে ফেরত আসবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। ভোটপর্ব মেটার পর থেকেই ডোমজুড়ে পরাজিত বিজেপি প্রার্থী রাজীব আপনি ক্রমশ গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে দূরত্ব এবং পুরনো দল তৃণমূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করেন। অবশেষে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। আচ্ছা রাজীববাবু, মমতার ছবি বগলদাবা করে কি ফেরার টিকিট আগাম কেটে রেখেছিলেন?

একবার ভাবুন কতটা সম্মান আপনি পেয়েছেন বিজেপিতে। আপনাকে দলে নেওয়ার জন্য অমিত শাহর পশ্চিমবঙ্গে আসার কথা ছিল। কিন্তু দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে দিল্লি ছাড়তে পারেননি তিনি। আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য কলকাতায় চাটার্ড বিমান পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিজেপি নেতারা বুঝতে ভুল করেছিলেন যে আসলে আপনি রাজনৈতিক ভাবে ফোঁপরা। ২০১৬ সালে ডোমজুড় থেকে রাজ্যে সর্বোচ্চ এক লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন। সেই বায়োডেটা দেখে আপনাকে অনেক বড়ো নেতা ভাবা ভুলই হয়েছিল। বিজেপির টিকিটে ২০২১ সালে সেই ডোমজুড়েই আপনি হেরেছেন ৪২ হাজারেরও বেশি ভোটে। বোঝা গিয়েছিল, আপনি কেউ নন, আগে ভোট পেয়েছিল তৃণমূল। এবারেও যেটুকু ভোট তার সবটাই পেয়েছে বিজেপি। পদ্ম প্রতীক। আর আপনি ভোটের পরে একটিবারের জন্য আক্রান্ত কর্মী, সমর্থকদের পাশে দাঁড়াননি। ডোমজুড়ে থেকে অনেক দূরে কলকাতায় বিলাসবহুল বাড়িতে আড়ালে থেকেছেন।

এর পরে কখনও তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বাড়িতে, কখনও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে গিয়েছেন। মুকুল রায়ের স্ত্রীবিয়োগের পরে কাঁচড়াপাড়ায় কিংবা তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃবিয়োগের পরে নাকতলায় দেখা গিয়েছে আপনাকে। সংবাদমাধ্যমকে বারবারই জানিয়েছেন, সব সাক্ষাৎই 'সৌজন্যমূলক'। কিন্তু এবার স্পষ্ট হয়ে গেল সবই রাজনৈতিক। সঅব।

আপনার এলাকা ডোমজুড়েই তৃণমূলের পোস্টার পড়েছিল 'গদ্দারদের আর দলে নয়'। আপনাকে নেওয়ার পরেও সরব আপনাকে হারানো বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শেষ পর্যন্ত দুই কল্যাণের কেউই আপনার 'কল্যাণ' আটকাতে পারেননি।

রাজীববাবু, বিজেপি কর্মীরা কোনও পোস্টার লাগায়নি আপনার নামে। তাঁরাও কিন্তু স্লোগান তুলতেই পারতেন—'গদ্দারদের আর দলে নয়'। ◻

অতিথি কলম

জয়তীর্থ রাও

মধ্যস্বত্বভোগী ও মধ্যপন্থার সংঘর্ষ ও সমাধান

লখিমপুর খেরিতে যত কাণ্ডই হোক না কেন সরকার ও তথাকথিত কৃষিজীবীদের সংঘাতকেও স্তিমিত করা যায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সালে তৎকালীন মাইসোরের একটি ছোটো শহরে আমার মামার ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার কথা মনে পড়ছে। নিতান্তই অবোধ ৭ বছরের কিশোর হিসেবে আমি মামাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মামা ছাত্ররা কী চায়? মামা জানিয়েছিলেন, জনৈক পুলিশ কমিশনার যিনি আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর নির্মমভাবে লাঠি চালিয়েছিলেন তাঁর অপসারণ। মামা অবশ্য এটাও বলেছিলেন ছাত্রদের মূল দাবি কী ছিল, এই দাবির চাপে সেটি সকলেই ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হয়েছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওই আক্রমণাত্মক কর্তার বিরুদ্ধে অবশ্যই কোনো টোকেন বদলি বা অন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি রক্ষার্থে ছাত্রদের মূল দাবিগুলির কথাও একটু নেড়ে চেড়ে দেখলেই হবে।

বিগত ৬০ বছরে এই ধরনেরই ছাঁচ আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে বা করা হয়েছে। মূল প্রতিবাদের বিষয়গুলি কালক্রমে হারিয়ে যায় বা ধামা চাপা দেওয়া হয়। যেহেতু নতুন প্ররোচনা ও তার হিংস্র প্রতিক্রিয়ার খবর তুমুলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ঠিক এই ধরনের ঘটনাই লখিমপুর খেরিতে ঘটেছে। তাহলে এখন কী করা যায়? কোনো স্বল্প বা মধ্যমেয়াদি সমাধানের ভবিষ্যতবাণী করা এই মুহূর্তে কঠিন। কিন্তু একথা কখনই জোর করে বলা যায় না যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভাবে হাতের বাইরে চলে গেছে। কোনো সুযোগই আর নেই এমনটা বলা নিতান্তই নেতিবাচক।

এমনটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে— লখিমপুর খেরির উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে এলে খরচ-উন্মুখ পাঠককুল আবার সমস্যার উৎসমুখের কথা নিশ্চয় ভাববেন। হ্যাঁ, তথাকথিত কৃষকদের কেন্দ্রের কৃষিক্ষেত্র ও কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নমুখী তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে হবে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় এক্ষেত্রে সরকার পারস্পরিক সংযোগ ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার প্রায় ভুলেই গিয়েছে আদতে এই বিলের অবধারণাটি আজকের মূল বিরোধী দলের (কংগ্রেসের) ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অথচ এই বিষয়টি ন্যূনতম এমনকী উড়ো খবর হিসেবেও এবারও রাজনৈতিক বাজারে ছাড়া হয়নি। এই কৃষি আইনগুলির উপজীব্য নিয়ে বিগত ২ দশক ধরে ব্যাপক আলোচনা, তর্কবিতর্ক চলেছে আর সেই প্রেক্ষিতে একজন অর্থনীতিবিদকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি এই বিলের বিষয়বস্তুকে সমর্থন করবেন না। বাস্তবিক ভারতের কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা নিয়ে যাদের প্রত্যক্ষ ধারণা ও অভিজ্ঞতা আছে তারা সকলেই বলবেন যে পরিবর্তনগুলি দীর্ঘদিন আগেই করা উচিত ছিল। কেননা এর দ্বারা তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন যে কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের জীবিকার মানোন্নয়নও হবে। এই বিলের অংশ বিশেষ হিসেবে প্রথম পদক্ষেপ রয়েছে জল সংরক্ষণ করে পরিবেশ সহযোগী চাষ করার উপায়। হায়! এই বিষয়টা আন্দোলনের উন্মাদ টিভি কভারেজ দেখাতে গিয়ে একবারও জনমাধ্যমে প্রচারিত হলো না। মানুষ জানলই না। প্রচারমাধ্যমগুলি এই সমস্ত বিষয়গুলিতে যে ঐকমত্য হয়েছিল তার ধারে কাছে না গিয়ে আইনগুলি কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত পক্ষের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা ছাড়াই সরাসরি সরকার ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়েছে— এটাই প্রচার করে গেল। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই দেশব্যাপী মিথ্যে গল্প উপাদেয় খাদ্য হিসেবে চলল।

এই সূত্রে বলতেই হবে যদি আপনি এই আইন মোতাবেক কোনো কৃষি পণ্যের উৎপাদন থেকে বিক্রি পর্যন্ত নিদানগুলি বিশ্লেষণ করেন দেখবেন কৃষক কখনোই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীরা যাদের উত্তর ভারতে 'আরবিয়া' বলে। আমি তো সারাজীবন ধরে এটাই জেনে এসেছি যে যথার্থ বামপন্থীরা চিরকাল মধ্যস্বত্বভোগীদের তীব্র ঘৃণা করে। কেন যে সরকার এই সমস্ত সমাজবাদীদের বিলটির স্বপক্ষে আনতে পারল না তা আমার কাছে একটি রহস্য।

মনে পড়ে প্রয়াত ড. মনমোহন সিংহ যখন বাংলাদেশ কনক্লেভ চুক্তি সই করেছিলেন সুষমা স্বরাজ কী চমৎকার পারদর্শিতা ও বিনম্রতার সঙ্গে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। আমার মতে যদি সরকার একটু কায়দা করে এই কৃষি বিলগুলির প্রাথমিক চিন্তক হিসেবে একটু ঘুরিয়ে চাণক্য নীতি প্রয়োগ করে ড. সিংহকে বিলের পরিকল্পনাকারীর মর্যাদা দিয়ে বলত তাঁর ভাবনার এতদিনের আরাধ্য কাজটি আজ শাসক দল আইনে রূপায়িত করতে পেরে এমন একজন বিরোধীনেতার জন্য গর্ববোধ করছে। এই সুযোগটা অবশ্যই হারিয়ে গেছে। কিন্তু বিষয়টা প্রবলভাবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি প্রচারের আলোয় এনে এগোনো যায় তাহলে সুফলের আশা করা যায়।

যাইহোক, আজকের বিতর্কিত আইনগুলির বিষয়ে পুনরায় ফিরে গিয়ে আবার আমার মামার প্রসঙ্গ তুলব। যার ফলে লখিমপুরের উত্তাপ কমার সঙ্গে বৃহত্তর ক্ষেত্রে আইনগুলি নিয়ে সংঘর্ষের পরিস্থিতি

কেটে গিয়ে স্থিরতায় পৌঁছনো যায়।

প্রথমত, আইনের যে অংশটিতে কৃষি জমি কর্পোরেট সংস্থাকে লিজ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেটি তুলে দেওয়া। বাস্তবে এই ধারণাটি আইনটিকে আপাতভাবে ক্রনি পুঁজিপতিদের (একচেটিয়া নির্দিষ্ট পুঁজিপতি) স্বপক্ষে করা হয়েছে— এই ধারণাটিকেই মদত দিচ্ছে। একই সঙ্গে এই প্রস্তাবটি সুযোগসন্ধানী আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমেরও সমালোচনার খোরাক জুগিয়েছে।

যদিও তারা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুল ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু তারা সুযোগ হাতছাড়া না করে আইনটিকে কর্পোরেটদের চক্রান্ত করে সরকারকে প্রভাবিত করে চাষিদের ক্ষতি করার প্রচেষ্টা হিসেবে চালিয়েছে। অন্যদিকে জমি বন্ধক রাখার বিষয়টি অনেক রাজ্য সরকার নিজেই নিতে পারে আবার যারা ঝুঁকি নিতে চায় না সেই রাজ্য সরকারগুলি না নিতেও পারে। কিন্তু এই পরিবর্তনটা করতে পারলে তথাকথিত যেসব মহান কৃষি ধর্ম-রক্ষক আকাশ ছোঁয়া বাণী দিচ্ছে— তারা নীরব হয়ে যেতে পারে। এটা এক ধাক্কায় করা সম্ভব।

তবে হ্যাঁ, খাতায়-কলমে শান্তি রক্ষার জন্য যে পরিবর্তনের কথা বলা হলো তা যদি করা যায় সেটিকে রূপায়ণের মাধ্যমে শান্তি রক্ষার প্রক্রিয়াটি চালু করা জরুরি। উত্তর প্রদেশ সরকার এ বিষয়ে রাকেশ টিকায়েতের মতো একজন সম্মানিত ও বলিয়ে কইয়ে মধ্যস্থতাকারীকে ইতিমধ্যে কাছে টানতে পেরেছে এবং সাহায্যও পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিলের আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি নিয়ে এই ধরনের মধ্যস্থতাকারীদের সহযোগিতা নিতেই পারে। এই মর্মে একেবারে মাটির সঙ্গে জুড়ে থাকা কৃষি বিষয়ে পারদর্শী পঞ্জাবের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দরকে অন্যতম সেরা মধ্যস্থতাকারী বলে আমার মনে হয়। স্বনিয়োজিত কৃষকনেতাদের জ্বালাময়ী ভাষণ থামিয়ে যদি প্রথমদিকেই অমরিন্দরকে দিয়ে এটা বলানো যেত যে জমির করপোরেট লিজ দেওয়াটা বাতিল করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে অন্য অনেক আনুষঙ্গিক বিতর্কিত বিষয়ও মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যেতে পারত। পরিণতিতে একটা মধ্যবর্তী শান্তির বাতাবরণ ফিরে এলে পূর্ণ সমাধানের কথা ভাবা সুবিধেজনক হতো। আর বিরোধী নেতাকে সামনে রেখে এমন সফলতা হাসিল করতে পারলে আমাদের বিশাল গণতান্ত্রিক ধাঁচার ক্ষমতা বিশ্ববাসী অবাক হয়ে দেখত, শুধু তাই নয় আমাদের ভৌগোলিক সীমানার উত্তরাংশে শত্রুরা অবনত মস্তকে উপলব্ধি করত ভারতে অসুবিধে সৃষ্টিকারী বিরোধীদের নিকেশ করে দেওয়া হয় না তাদের ইতিবাচক ভূমিকা দেওয়া হয়। আর রাজনীতির কথা বললে এতে শান্তি ফেরার সম্ভাবনার সঙ্গে বিরোধীদের দুর্বল করে দেওয়ারও সুযোগ রয়েছে।

কেননা এই সমস্যাটার একটা সন্তোষজনক সমাধান করতে পারলে আমরা বাড়তি উদ্যমে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্ররোচনা ও উত্তেজনামূলক খবরের চেয়ে টিভিতে তুলনামূলকভাবে বোরিং কিন্তু সঠিক কিছু খবরও শুনতে পারি।

(লেখক একজন উদ্যোগপতি)

ব্রহ্মলীন স্বামী দয়াপ্রকাশ আরণ্য

কপিল মঠ, মধুপুরে (ঝাড়খণ্ড) ৩ অক্টোবর নিঃশব্দে চলে গেলেন স্বামী দয়াপ্রকাশ আরণ্য। যাঁর পূর্বাশ্রমের নাম সুধাংশু রায়। কলকাতা টালিগঞ্জ রিজেন্ট কলোনি শাখার স্বয়ংসেবক এবং দীর্ঘকাল প্রচারক ছিলেন। পরবর্তী জীবনে মধুপুর কপিল মঠে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা এবং সন্ন্যাস দীক্ষা নেন। পরিব্রাজক রূপে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মঠ মিশন আশ্রমে পরিভ্রমণ করেছেন।

কলকাতা টালিগঞ্জের দাদার কাছে থাকার সময় ১৯৭৫ জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে জেলে (প্রেসিডেন্সি জেল) যান। জেল থেকে বের হয়ে আর ঘরে ফিরে যাননি। প্রচারক জীবন গ্রহণ করে প্রথমে বসিরহাট পরে মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমা প্রচারক, পরে উত্তর কলকাতা ও উলুবেড়িয়াতে প্রচারক ছিলেন। পরে কিছু সময় বিজেপিতে সংগঠনের কাজে ছিলেন।

২০০২ সালে কপিল মঠ মধুপুরে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন তীর্থস্থান, মঠ, মিশন, আশ্রমে পরিভ্রমণ করতেন। শেষের দিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে কোথাও যেতে পারতেন না। শেষ মাসাধিককাল মধুপুর মঠে গুরুর সান্নিধ্যে ছিলেন। ক্রমশ শারীরিক অবনতি হতে থাকে এবং শেষের দিকে অন্ন জল ও ত্যাগ করেছিলেন। অবশেষে ৬৫ বছর বয়সে ৩ অক্টোবর দুপুরে তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

শোকসংবাদ

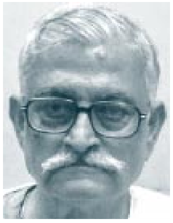

হাওড়ার প্রবীণ স্বয়ংসেবক দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গত ১৮ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। দীর্ঘকাল তিনি হাওড়া মহানগরের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বালানন্দ সঙ্ঘ, রিষড়া প্রেমমন্দির, মিত্রসঙ্ঘ হাসপাতালে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। তিনি কখনো নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে আপোশ করেননি। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ চিকিৎসক পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতার বিজয়গড় শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য গত ১২ সেপ্টেম্বর করোনা আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি বহুদিন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজে যুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশের হিন্দুনিধন এবং এদেশের সেকুলারবাদীরা

সম্প্রতি বাংলাদেশে দুর্গাপুজোর সময় হিন্দুদের ওপর কী নৃশংস ও নারকীয় অত্যাচার হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া ও স্বস্তিকা পত্রিকার দৌলতে তা সবার জানা। তারপর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সেকুলারবাদীদের পক্ষ থেকে কিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রথম প্রতিক্রিয়া নিয়ে অবশ্য বিস্ময়ের বিশেষ কোনো কারণ নেই। যথারীতি যে অপযুক্তিকে আশ্রয় করে সেকুলারবাদীদের সর্বাধিক জনপ্রিয় বুলি 'সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না', এবারও সেটি তাঁরা নিয়মমাফিক আওড়েছেন। 'ত্রিপুরায় মসজিদে হামলা হলো কেন' ইত্যাদি বলে যথারীতি বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিষয়টিকে লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তার পরে বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা তো আছেই, যে তারা কতটা কঠোর হাতে মৌলবাদীদের মোকাবিলা করেছে। এবার তার সঙ্গে অতিরিক্ত যুক্ত হলো, ভারত নাকি তাদের দেশে বসবাসকারী তথাকথিত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সেদেশের সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় কতটা আন্তরিক তা প্রমাণেরও চেষ্টা করা। মোটের ওপর পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে, বিশেষ করে ইসলামিক দেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে এদেশের সেকুলারবাদীদের এসব অপযুক্তির নজির নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবার তার সঙ্গে সঙ্গে একটি অভিনব ঘটনাও ঘটেছে। সম্প্রতি কলকাতার বহুল প্রচারিত একটি বাংলা দৈনিক খবর করেছে, ধর্মতলার একটি রেস্টুরেন্ট নিজামে নিষিদ্ধ মাংসের রোল আবার ফিরছে। খবরটির আদ্যোপান্ত পড়ে বোঝা গেল, কোনো এক অজানা কারণে কয়েকবছর আগে নিষিদ্ধ মাংসের রোল করা বন্ধ করে দেয় ওই খাবারের দোকানের কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি আবার তা চালু হচ্ছে। খুব মজার ব্যাপার খবরটি সংবাদপত্রে প্রচার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকুলারবাদীদের দ্বারা সোশ্যাল মিডিয়ায় তা ভাইরাল হয়। সঙ্গে আরও একটা খবর কলকাতার অন্য একটি দৈনিকে জায়গা করে নিয়েছে, যে জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতায় সরব বিশিষ্ট 'শিক্ষাবিদে'রা। এই বিশিষ্টদের তালিকায় রয়েছেন রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিবের মতো 'ইতিহাসবিদে'রা। এঁদের মূল বক্তব্যেরও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, 'পুরাণ ইতিহাস নয়'।

আপাতদৃষ্টিতে এগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হতে পারে। এও মনে হতে পারে, এই ঘটনাগুলোর মধ্যে দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, ঘটনাগুলোর মধ্যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে সারা বছরের কোনো না কোনো সময়, বিশেষ করে দুর্গাপূজায় হিন্দুদের ওপর হামলা হয়। প্রতিবারের মতো এবারও মূলস্রোতের সংবাদমাধ্যম সেটা চেপে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু এবার এটা করতে তারা ব্যর্থ হয়। কারণ সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বাংলাদেশি মৌলবাদীদের বর্বরতা এবার প্রকাশ্যে এসেছে।

বাংলাদেশে এই মৌলবাদী তাণ্ডবের ঘটনায় সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছে এদেশের সেকুলারবাদীরা। যারা প্রতিনিয়ত দুই বাঙ্গলার মিলনের খোয়াব দেখে। এবং ভারত থেকে রাজনৈতিক ভাবে না পারুক, সাংস্কৃতিক ভাবে অন্তত ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করতে প্রয়াস চালায়। '৪৭-এর পর নেহরুবাদীদের যুক্তি ছিল, ভারত কখনো 'পাকিস্তানে' পরিণত হবে না, এখানে তথাকথিত সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত থাকবেন। আর এই সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত করতে গিয়ে দিনের পর দিন অবদমিত করা হয়েছে হিন্দুদের এবং আজ স্বীকার করার সময় এসেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকায় হিন্দুরা নিজভূমে পরবাসী হয়েছেন। '৭১-এ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঘটনায় পাকিস্তান বেআব্রু হলে বাংলাদেশের জন্ম হয় এবং এতকাল পর্যন্ত '৪৬-এর 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর পার্শ্বনায়ক হিন্দু-বিদ্বেষী খুনি শেখ মুজিবুর রহমান আচমকাই 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র প্রতীকে পরিণত হন, নবগঠিত বাংলাদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা; আমদানি করার জন্য। ইতিহাস সাক্ষী, সেই শব্দকে প্রহসনে পরিণত করে, কবেই তা জলাঞ্জলি দিয়ে বাংলাদেশ তাদের পিতৃদেশ, দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। আর সেই মৌলবাদের আঁতুড়ঘরকে আড়াল করতেই কখনো বৃহত্তম বাঙ্গালি-ঐক্যের কথা বলা হয়েছে, কখনো-বা বাঙ্গালি হিন্দু-মুসলমান যৌথ সংস্কৃতির গল্প ফাঁদা হয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হিন্দু-নিধনের অসারত্ব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সেই কারণে গা বাঁচাতে 'পক্ষ' নামধারী তথাকথিত বাঙ্গালি পক্ষাবলম্বী একটি ভুঁইফোড় সংগঠন একে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে এড়িয়ে গিয়েছে। এবং একইভাবে 'নিজামে নিষিদ্ধ মাংস ফিরে এল', 'পুরাণ ইতিহাস নয়' কিংবা ধরুন এক চরম সাম্প্রদায়িক বলিউড অভিনেতার ড্রাগ-পাচারে অভিযুক্ত ছেলের জামিনে মুক্তি উপলক্ষ্যে উল্লাস প্রকাশ করার একটাই লক্ষ্য, হিন্দুদের ধৈর্যের চরম পরীক্ষা নেওয়া এবং সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটি একটি ফাঁদ বই আর কিছু নয়।

এই দ্বিচারিতার পালা এবার সাঙ্গ করার সময় হয়েছে। বাঙ্গালিকে বুঝতে হবে নেহরু-জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ-বিভাজন হয়েছিল। তারপর এই বিষবৃক্ষ রোপিত হওয়ার ফলে কোনো ভারতীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীতেই আর মুসলমানরা নিজেদেরকে ভারতীয় বলে ভাবতে পারে না। এটাই এই মুহূর্তে 'উপমহাদেশে'র (অর্থাৎ এককালের অখণ্ড ভারতবর্ষ) রাজনীতিতে চরম সত্য। এই বাস্তবতা না বুঝলে এতাবৎ অঞ্চলের হিন্দুরা নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনবেন।

ভারতে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানত এম.এন. রায়ের উদ্যোগে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টির গঠনে রাশিয়ার লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব ও তাদের ক্ষমতা দখল অনুঘটকের কাজ করে। পার্টির প্রথম চেয়ারম্যান যদিও দক্ষিণী ব্রাহ্মণ এম.পি.টি. আচার্য, কিন্তু সংগঠনের প্রাণপুরুষ নিঃসন্দেহে এম.এন. রায় এবং তাঁর সহধর্মিণী ইভলিন রায়। এম.এন. রায় বলশেভিকদের অনুসরণে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের থেকে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। তারপর তিনি ধর্মান্ধ মুসলমান 'মুহাজির' সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে নেতা-কর্মী সংগ্রহের চেষ্টা করলে তা অধিকতর সাফল্য লাভ করে। এদের মধ্যে নেতৃত্বে আসা মহম্মদ আলি ও মহম্মদ সফিক উল্লেখযোগ্য। এই সফিক পার্টি গঠনের শুরুতে দলের প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি হন।

মুহাজির সম্প্রদায় আগ্রাসী প্যান-ইসলামিজমে বিশ্বাসী। এদের ইংরেজ বিরোধিতার কারণ কিন্তু ভারতের পরাধীনতা নয়। তাদের ইংরেজ বিরোধিতার সূত্রপাত হলো অটোমান সাম্রাজ্যের তুর্কি খলিফার শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব করার জন্য। ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজদের সখ্য এবং খিলাফত আন্দোলনকে ইংরেজ সরকারের পক্ষে কোনোরকম পাত্তা না দেওয়া— এই দুটি কারণে ধর্মান্ধ মুসলমান সমাজের একটি বড়ো অংশ ইংরেজদের বিরোধিতায় নামে। সঙ্গে অবশ্যই মুসলমান শাসকদের থেকে ইংরেজদের শাসনভার নেওয়া যা এদের কাছে ইসলামের অবমাননা বলে এরা মনে করে! খিলাফত আন্দোলন একটি জিহাদি ইসলামি আন্দোলন। আশ্চর্যজনকভাবে এই আন্দোলনকারীদের একটি বড়ো অংশ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে শুধু যে যুক্ত হলো তাই নয়, কমিউনিস্ট আন্দোলনের বড়ো মুখ হিসেবে তারা চিহ্নিত হলো। এরা মননে-স্বপনে পুরোপুরি প্যানইসলামি মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় 'খ্রিস্টান' ইংরেজ শাসককুল এদের কাছে শত্রু হিসেবে পরিগণিত হলো। এদিকে খিলাফত আন্দোলন যখন ঐতিহাসিক কারণে তার গতি হারালো, তখন থেকে এই জিহাদি প্যানইসলামিরা কমিউনিস্ট দলে তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় পেল। তারপর যখন কামাল পাশা তুরস্কের শাসনভার হাতে নিয়ে খলিফা পদেরই অবলুপ্তি ঘটালেন, তখন এই ইসলামি কমিউনিস্টদের বড়ো অংশ রাশিয়ার সামরিক ট্রেনিং পাওয়ার পর ওই দেশের সামরিক বিভাগে যোগদান করল। আর অন্য কয়েকটি অংশ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর বাকিরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে রয়ে গেল। এদের রাজনীতি রাশিয়ার বলশেভিকদের, পরবর্তীতে স্ট্যালিনের রাশিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। রাশিয়া থেকে আর্থিক ও বিভিন্ন অনুদান বিভিন্ন ভাবে আসত।

ভারতে ধর্ম বাদ দিয়ে রাজনীতি বা এক ধর্মকে তোল্লা দিয়ে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে রাজনীতি— এর কোনোটাই সাফল্য পাবে না। ধর্মীয় অবস্থান পরিবর্তন না করলে ভারতে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এদের লজিস্টিক সাপোর্টও রাশিয়া থেকে আসত। এর মধ্যে রাশিয়ার কমিউনিস্টদের অনুকরণে প্রথমেই চার্চগুলির ধর্মীয় অধিকার খর্ব করার জন্য যে বিরোধিতা করার কথা বলা হলো তার বহিরাঙ্গিক রূপ হলো সেকুলারিজম্ বা ধর্মনিরপেক্ষতা। রাশিয়ায় চার্চের কায়েমি স্বার্থ কমিউনিস্টদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় সেখানে যে ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠ দেওয়া হলো তা এখানকার কমিউনিস্টরা ভারতে প্রয়োগ করতে গেল। ফল হলো মারাত্মক। ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সামাজিক বন্ধন সব কিছুই ধর্মভিত্তিক। এই দেশের মানুষের মনুষ্যত্বের দিক নির্দেশক হচ্ছে ধর্ম। এ কোনো বিশেষ রিলিজিয়ন নয়। এই ধর্মের কোনো একটি বিশেষ পুস্তক বা 'আদেশ' সংবলিত তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ নেই। এই ধর্ম-সংস্কৃতি ভারতীয়দের সঙ্গে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে সংপৃক্ত। ফলে, কমিউনিস্টদের এই ধর্মীয় অপধার্মিকতা প্রথম থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ ভালোভাবে নিল না। কিন্তু পার্টি তো রাখতে হবে! তাই একটি কৌশল করা হলো। যে ধর্মের বিরোধিতা করলে সেই ধর্মের মানুষদের তো পাওয়া যাবেই না, উপরন্তু তারা কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করবে, তাই ধর্ম সম্পর্কে মৌন থেকে সরাসরি হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করা শুরু হলো! এইভাবে এগোতে গিয়ে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' রূপ পেল জেহাদি ইসলামি সমর্থকদের মতো সরাসরি হিন্দুধর্ম বিরোধিতায়। এর সাম্প্রতিক রূপ হিসেবে আমরা বাংলাদেশে দুর্গাপুজোয় ভাঙচুর ও সরাসরি হিন্দু নিধন, লুঠপাট, ধর্ষণের যে ঘটনার কথা আমরা জেনেছি, যার নিন্দায় সারা পৃথিবী সরব হয়েছে— শুধু ইসলমি কিছু দেশ এবং তথাকথিত কমিউনিস্ট শাসিত দেশ কোনো প্রতিবাদ করেনি— সেই ঘটনার সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট দলগুলি মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। এমনকী কিছু কমিউনিস্ট ক্যাডার এই ঘটনাকে পরোক্ষে সমর্থন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে!

কমিউনিস্টদের চিন্তাধারা সর্বদা বিদেশ থেকে আমদানি করা আর তা সেইসব দেশের স্বার্থে তৈরি বলে তা কখনোই ভারতীয় প্রেক্ষাপটে খাপ খায়নি। যেমন শুরুতে

ফঃ ২

ইংরেজদের বিরোধিতা থাকলেও পরে যখন ইংল্যান্ড ও রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এক ফ্রন্টে জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামল, ভারতীয় কমিউনিস্টরা জার্মানির শতেক দোষ ও ইংরেজদের ততোধিক গুণ আবিষ্কার করল! তখন ভারতে কংগ্রেস ও বিপ্লবীরা ভিন্ন পথে দেশ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের চেষ্টা করলেও কমিউনিস্টরা ইংরেজ শাসকদের সঙ্গেই নিজেদের সংযুক্ত রাখল। যদিও খিজার হুমায়ুন আনসারী আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত সোশ্যালিস্ট (যদিও এরাই ভারতীয় কমিউনিস্ট) শিক্ষিত মানুষজনের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা বলেছেন, তবে সেই সব বিদ্বজ্জন, যেমন, মৌলানা হাসরত মোহাইন, কাজী আব্দুল গফ্ফর, রফি আহমেদ কিদওয়াই, মহম্মদ হাবিব, সাগির নিজামি, ইস্মত চুঘতাই, ইসরারুল হক মাজাই, কে. এম. আশরফ, আলি সর্দার জফরি ও জান নিসার আখতার— এদের স্বাধীনতা সংগ্রমে অবদান নাকি ভারতীয় ইতিহাসবিদরা ঠিকমতো তুলে ধরেননি!

আসলে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, কমিউনিস্ট প্রচার গোয়েবেলসীয় প্রচারকেও হার মানায়। কয়েকটি তথ্য উপস্থাপন করা যাক। প্রথমত, খিলাফত আন্দোলন পরবর্তী সময়ে ভারতীয় শিক্ষিত মুসলমান সমাজের এক বড়ো অংশ সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল আর অন্য একটি অংশ সরাসরি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর একটি কারণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। কোরান-হাদিস পড়া শিক্ষিত মুসলমানের কাছে হিন্দুরা কাফের। কোরান অনুসারী মুসলমান মাত্রই কাফেরদের মূর্তি পূজার বিরোধী। কমিউনিস্টরা এই পূজার সরাসরি বিরোধিতা করলেও মুসলমানদের মজহবি আচারের কোনো বিরোধিতা করেনি। সুতরাং ইসলামি আচার আচরণ পালন করেও কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভব। আমি কর্মসূত্রে এক বিখ্যত কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে মিটিঙের সময় জানলাম যে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন! তাই আমাদের পূর্ব নির্ধারিত মিটিং পিছিয়ে গিয়েছিল। এর থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার। ইসলামি আচার অনুষ্ঠান পালন করে কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভব। কিন্তু কমিউনিস্টরা ঘোষিত নীতিতেই হিন্দুদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করায় কোনো যথার্থ হিন্দু কমিউনিস্ট হতে পারেন না। যদি আলিগড়ি কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের পরম্পরা হতো স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা, তাহলে ক'জন মুসলমান ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন? ক'জন মুসলমান আইন অমান্য করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জেল খেটেছেন? এই সংখ্যাটা অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যার হিসেবে বিচার করলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আধুনিক শিক্ষা কোনো মুসলমানকে সহনশীলতা শেখায় না। কারণ ধর্মীয় বিধান অনুসারে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ইসলামের অঙ্গ। কোনো ধার্মিক মুসলমানের কাছে তা অপরাধ নয়। এই অবধি ঠিক আছে। কিন্তু যখন ধর্মনিরপেক্ষ কমিউনিস্টরা তা মেনে নেয়, সেটা হয়ে যায় 'ভাবের ঘরে চুরি'।

আবার স্বাধীনতার পরে কিছু মুসলমান বিদ্বজ্জনকে ভারত সরকার অন্তর্ভুক্ত করলেও তাদের ধর্মীয় প্রভুত্ব করার স্পৃহা কমেনি, তাঁরা কেউই ধর্মনিরপেক্ষতা দূরের কথা, সর্বধর্ম সমন্বয়ের তত্ত্ব সমর্থন করেছেন বলেও জানা নেই। যখন মুসলিম লিগ জিন্নার নির্দেশে ডাইরেক্ট অ্যাকশানের নামে বিনা প্ররোচনায় হিন্দুদের হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনে নেমেছিল, জিন্নার শিষ্য গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে বাঙ্গলা জুড়ে হিন্দুদের উপর শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধে চরম অত্যাচার করছিল; তখন মুসলিম লিগে জিন্নার প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক উচ্চশিক্ষিত ব্যারিস্টার হুসেন সুরাবর্দি অত্যাচারে জিন্নার দলবলকেও ছাপিয়ে গেলেন। সেই সময় ক'জন আলিগড়ীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান এই হিন্দু নিধন বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন? ক'জন এই গণহত্যার প্রতিবাদ করেছেন? ক'জন কমিউনিস্ট নেতা এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন?

কমিউনিস্টরা স্বাধীনতার আগে যেমন রাশিয়ার নির্দেশে ইংরেজ সরকারের লেজুড়বৃত্তি করেছে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তারই উত্তরাধিকারী হিসেবে নতুন স্লোগান তুলেছে, 'ইয়ে আজাদি ঝুঠা, ভুলো মত্, ভুলো মত্'। এইভাবে স্ববিরোধী ও দেশের বৃহত্তর অংশের মূল্যবোধকে মান্যতা না দেওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি বারবার ভাঙনের মুখে পড়েছে। তারা চোখ বন্ধ রেখে এইসব ভাঙনকে ideological difference বলে চাপা দিতে চেষ্টা করেছে। যেমন, চীন যখন ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণ করে তখন একদল কমিউনিস্ট চীনের প্রসাদ পাওয়ার লোভে বলতে থাকে— চীন নয়, আক্রমণকারী হলো ভারত। নেতা হবার উদগ্র বাসনার চীনের উচ্ছিষ্ট লাভের জন্য এই নেতারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে সিপিআই(এম) পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী) তৈরি করে। তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া কি মার্কসবাদকে স্বীকার করেনি! আবার এই নতুন পার্টি কয়েক বছরের মধ্যে ভেঙে চীনের প্রচ্ছন্ন মদতে বিভিন্ন নাম দিয়ে ধীরে ধীরে টুকরো হতে লাগল। আসলে এসবের মূল কারণ নেতৃত্বের লোভ, সত্যিকারের নীতিহীনতা এবং বিদেশি শক্তির হাতে ক্রীড়নক হওয়ার ফল।

এভাবে ভারতের সকল জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করা এবং শত্রু দেশের সমর্থনে কথা বলা— এমন সব কাজ করতে করতে কবে যে কমিউনিস্ট দলগুলি ভারতের জাতীয়তা বিরোধী হয়ে গেছে তা এরা নিজেরাও বুঝতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য, পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে জাতীয়তাবোধ ধ্বংস করার রাজনীতি করা হয়। ব্যতিক্রম শুধু ভারত। এর দায় কিন্তু দেশের সরকারের উপরেও বর্তায়, এদের এমনভাবে বাড়তে দেওয়ার জন্য। এর ফল, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিস্টদের সমাবেশে স্লোগান ওঠে, 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে'— যা পাকিস্তানের ভারত বিরোধী জেহাদিদের স্লোগান!

এইসব ঘটনা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি জেহাদি শুধু নয়, সমগ্র ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে অশুভ আঁতাত বা তাদের সমস্ত ধ্বংসাত্মক কাজের সমর্থন করে ধীরে ধীরে কমিউনিস্টরা ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তি ও জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী কাজেই নিজেদের নিয়জিত করেছে। কোনো দেশের এমন কোনো দল নেই যারা এমন দেশবিরোধী নীতি নিয়ে চলতে পারে। এর ফলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সংস্কারের মতো সর্বজনগ্রাহ্য নীতি নিয়ে চললেও কমিউনিস্টদের জন্মলগ্ন থেকে দুটি মারাত্মক আত্মঘাতী নীতি ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে ইসলামি জেহাদি তোষণ ও জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর আচরণের জন্যই কমিউনিস্ট পার্টিগুলি আজ ভারতে জনবিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হয়েছে। একথা সত্যি যে, ভারতে ধর্ম বাদ দিয়ে রাজনীতি বা এক ধর্মকে তোল্লা দিয়ে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে রাজনীতি— এর কোনোটাই সাফল্য পাবে না। ধর্মীয় অবস্থান পরিবর্তন না করলে ভারতে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বিশেষ নিবন্ধ

মোপলাদের বর্বরতাকে বামপন্থীরা চেপে রাখতে চায়

রামমাধব

ফ্যাসিবাদীরা ইতিহাস বিকৃত করার জন্য কুখ্যাত। কিন্তু কমিউনিস্টরা এই বিষয়ে ওদের থেকে এক কদম এগিয়ে। এরা ক্ষতির বিচার না করে ইতিহাস শুধু বিকৃতই করে না, বিরোধী পক্ষকে ফ্যাসিবাদীও আখ্যা দেয়। স্ট্যালিন ইহুদিদের ফ্যাসিবাদী বলেছেন। ব্রেজনেভ তো পুরো পুঁজিবাদী পশ্চিমি জগৎকেই ফ্যাসিবাদী আখ্যা দিয়েছেন। এদের মতে ভারতের রাষ্ট্রবাদী লোকেরাই ফ্যাসিবাদী। ইতিহাস বিকৃত করার মানসিকতা নিয়ে স্ট্যালিন চেয়েছিলেন ১৯৪১ সালটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রবেশ বর্ষ হিসাবে ইতিহাসে দেখানো হোক। ১৯৩৯-৪১ এই সময় নাজিবন্ধু হিটলারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, ১৯৩৯-এ পোল্যান্ড আক্রমণ, ১৯৪০-এ বাল্টিক দেশে হামলা, ১৯৪০-এ কেটিনে হাজার হাজার পোলিশের হত্যা সব কিছুই পর্দার পিছনে লুকিয়ে রাখা হয়।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন একটি আইন প্রণয়ন করেছেন যাতে বলা হয়েছে ১৯৩৯-৪১ সালের ঘটনাগুলির সম্পর্কে কথা বলা অপরাধ। রাশিয়ায় সুপ্রিম কোর্ট এর থেকেও এগিয়ে। এই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে পুনঃপ্রচার করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

মোপালাদের বর্বরতা :

ইতিহাসবিদ টিমোথি স্নাইডার এই ব্যবহারকে 'নিয়ো-ফ্যাসিবাদ' অর্থাৎ বিখণ্ডিত ফ্যাসিবাদ বলেছেন। ভারতীয় বামপন্থীদের জন্য নিয়ো-ফ্যাসিবাদ কোনো নতুন কথা নয়। এরা নিজেদের ইচ্ছায় ইতিহাসকে ভেঙেচুরে নতুন রূপ দেয় কিন্তু তথ্য দিয়ে যারা কথা বলেন তাদের এরা ফ্যাসিবাদী আখ্যা দেয়। কমিউনিস্ট নিয়ো- ফ্যাসিবাদের তাজা উদাহরণ হলো ১৯২১-এর মোপলা বর্বরতার ইতিহাস বিকৃত করার প্রচেষ্টা।

আরবের মুসলমান প্রবাসীদের শুরুর দিকে যে বংশজরা ছিল তারাই মোপলা অর্থাৎ উত্তর কেরলের মালাবার উপকূলে অধিক সংখ্যায় থাকত। মোপলা নেতাদের সাধারণ ভাবে কট্টর এবং হিংসাত্মক রূপে দেখা হয়। সিপিএমের বড়ো নেতা এমএস নামবুদরিপাদ নিজের লেখা বই 'কেরলথিণ্ডে দেশীয় প্রশ্নম' (কেরলের রাষ্ট্রীয় সমস্যা) এই প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি ধর্মীয় কট্টরপন্থী ছিলেন, তাঁর মতে কাফেরদের মারা বা ধর্ম পরিবর্তন করানো স্বর্গের পথ খুলে দেয়।

কংগ্রেস নেতারা ১৯২০-তে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিল এবং এটিকে খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জুড়েছিল। মোপলা নেতারা খিলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খিলাফতের নামে মোপলা নেতাদের হিংসাত্মক মনোভাব হিন্দুদের পিছিয়ে যেতে বাধ্য করছিল। গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের নেতা সৌকত আলির সঙ্গে মিলে এই ক্ষেত্রটিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। যদিও গান্ধীজী এর শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের পক্ষে কথা বলেছিলেন। যেখানে সৌকত আলি জেহাদের ভাষায় কথা বলেছিলেন। মোপলাদের প্রধান মুখ কুঞ্জ আহমেদ হাজি কংগ্রেস-এর 'হিন্দু ছবি'কে দোষ দিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে শামিল হতে অস্বীকার করে। তিনি ১৯২১-এ খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন। বহু সংখ্যায় ছুরি, চাকু, তলোয়ার আর অন্য ঘাতক অস্ত্র তৈরি করা হয়েছিল। চারদিকে হিংসা ও অগ্নিসংযোগ করা চলছিল।

যদিও তুর্কি স্তোনে, মুস্তফা কামাল পাশার মতো সেকুলার নেতার দ্বারা খলিফাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মালাবারে কংগ্রেস যা পেয়েছে তা স্বরাজ নয়, খিলাফত। ইংরেজরা মোপলাদের প্রতিরোধ করেছিল। এর বদলে মোপলারা সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে। পরের চার মাস মালাবারের হিন্দুদের জীবন নরক হয়ে উঠেছিল।

গান্ধীজীর অনুশোচনা :

দুঃখী গান্ধীজী অনুতপ্ত হয়ে বললেন, মালাবারে যা হলো তা আমাদের ক্ষত হিসেবে থাকবে। আমার মন কেঁদে ওঠে যখন ভাবি যে আমার মুসলমান ভাইয়েরা কি পাগল হয়ে গেল।' ডাঃ আম্বেদকর স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি লিখেছেন, মোপলাদের হাতে হিন্দুদের ভাগ্য খুব দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। মোপলাদের দ্বারা প্রকাশ্যে হিন্দুদের হত্যা, জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণ, মন্দির অপবিত্র করা, অত্যাচার, লুটপাট করা— সংক্ষেপে বলা যায় যে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার সব সীমা অতিক্রম করে গেছে। তৎকালীন ব্রিটিশ রেকর্ড ও মিডিয়া কভারেজ এই বর্বরতার স্পষ্ট বিবরণ প্রদান করেছিল। খবরের কাগজে লেখা হয়েছিল, এক লক্ষের বেশি ঘরছাড়াদের জন্য ডজনখানেক শিবির তৈরি করা হয়েছিল। একজন মালয়ালম লেখক মোপলাদের ভয়াবহ অত্যাচারের কথা লিখেছিলেন। নারায়ণ গুরুর এক নিকট শিষ্য কুমারনাশন ১৯২২-এ লেখা এক কবিতাতে স্পষ্ট ভাবে মোপালাদের হিন্দুদের ওপর বর্বরতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

সিজো-ফাসিবাদের প্রারম্ভিক সময় :

১৯৭১-এ কেরলে যখন কমিউনিস্ট সরকার মোপলাদের 'স্বতন্ত্র সেনানী' ঘোষণা করে তখন সিজো-ফ্যাসিবাদের শুরু হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি হিন্দুদের কষ্টের কথা একেবারেই বলেনি উলটে হাস্যস্পদভাবে ঘোষণা করে যে দশ হাজার মোপলা মারা গেছে। নেপোলিয়ান একবার বলেছিলেন, 'ইতিহাস আসলে কী, এটি পরস্পর সহমতির দ্বারা বানানো একটি কাহিনি মাত্র। কেরলে বামপন্থী ও কংগ্রেস অতীতে এই কথাটিকেই সত্যি প্রমাণিত করে হাত মিলিয়েছিল। ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকা থেকে মোপলা নেতাদের নাম সরিয়ে সিজো-ফ্যাসিবাদ পালটাতে চাইছে। এই প্রচেষ্টা কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। যে নামগুলি হঠানোর সুপারিশ করা হয়েছে, তার মধ্যে হিন্দু নামও রয়েছে। এটা কেবল ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার জন্য। কেননা যেমন একবার জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন 'যারা ইতিহাস ভুলে যায় তা পুনরাবর্তনের জন্য তারা দায়ী হয়।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সমিতির এবং ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য)

প্রধানমন্ত্রী হবার দিবাস্বপ্ন দেখছেন মাননীয়া

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্যের মাননীয়া দিদির দল এবার দিল্লি চলোর ডাক দিয়েছে। তাতে কোনো আপত্তি নেই। আগে দিদির দলকে ঠিক করে নিতে হবে, দলটার প্রকৃত সুপ্রিমো কে? কে চালাচ্ছে রাজ্যের শাসক দলকে? কার অঙ্গুলি হেলনে আন্দোলিত হচ্ছে রাজনৈতিক ধ্বজা? দলের কর্মী সমর্থকদের কাছে এই প্রশ্নকটি রাখার একটিই কারণ, রাজ্যের শাসক দল আজ আর তৃণমূল নয়, এটা একটি কর্পোরেট সংস্থার কর্ণধার প্রশান্ত কিশোর নামক এক ব্যক্তির সংস্থার দ্বারা পরিচালিত। রাজ্যের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর নির্দেশিত রাস্তাতেই এগোচ্ছে রাজ্যের শাসক দল আর তার তথাকথিত সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই শাসক দল নিজ ক্ষমতায় নাকি অন্য রাজ্যের শাসন ভার দখল করবে!

কথা শুরুর আগেই বহু চর্চিত কথাগুলি আবার বলতেই হলো। কেননা রাজ্যের শাসক দল এখন চাইছে আঞ্চলিক দলের তকমা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে, একটা সামান্য হলেও জাতীয় দলের মর্যাদা পেতে। আর সেই মর্যাদা পেতে বাঙ্গালি রাজ্য ত্রিপুরায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে তৃণমূল, অন্যদিকে গোয়াতেও একই উদ্দেশে যাত্রা। দুটি জায়গাতেই একই নাটক, একই চিত্রনাট্য। অভিনেতা-অভিনেত্রী শুধু পালটাচ্ছে। দুর্ভাগ্য, তৃণমূল সুপ্রিমোর পা ভাঙার নাটক ওখানে খাবে না জেনে, কর্মীদের ওপর হামলার নাটক অভিনীত হচ্ছে। এবার ভাঙা গাড়ি, ছেঁড়া ফ্লেক্স, ভাঙা অফিস ঘর, দলীয় কর্মীদের ওপর সাজানো হামলা, নিজেদের সাজানো লোক দিয়ে নিজেদের মিছিলের ওপর হামলার চিত্র প্রদর্শনী হবে আগামী কয়েকদিন। সবই অভিনীত হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যে ফল আশা করেছিল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল, সে আশায় জল ঢেলে দিয়েছে স্থানীয় জনগণ। তৃণমূল সুপ্রিমো শেষে হয়তো মাঠে নামবেন। মঞ্চে নেমে, একটা হামলার ছক সাজাবেন। আর বলতে শুরু করবেন, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে কেউ। যেমনটা তিনি বলে থাকেন। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেও বিমানে পাশের সিটে হত্যাকারী পাঠিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন। যদিও গল্পটি ছিল সস্তা কল্পনাপ্রসূত।

চর্চায় এখন আবার সেই দল ভাঙানোর খেলা। গোয়ায় ঘর ভাঙল কংগ্রেসের। আবার কংগ্রেসকেই কেন্দ্রে অচ্ছ্যুত করার লক্ষ্যে নেমেছে রাজ্যের তৃণমূল। মহাজোট গড়ার একটা ডাক দিয়েছিলেন সুপ্রিমো। সেখানে এখন হাতে গোনা কয়েকটি দল টিম টিম করে টিকে আছে। যত দিন যাবে কিছু আঞ্চলিক দল হয়তো সঙ্গে থাকার চেষ্টা করলেও, বৃহৎ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সে সঙ্গে থাকবে না, সেটা প্রাথমিক ভাবে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। আরও স্পষ্ট যে কংগ্রেস হয়তো থাকবে না সেই জোটে। কংগ্রেসের পথকে অনুসরণ করবে তাঁর সহযোগী দলগুলি। এরাজ্যে অবশ্যই সংযুক্ত মোর্চা।

শাসক দলের পরামর্শদাতা পিকের প্রসঙ্গে আসা যাক। একটি প্রবাদ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, 'ঝড়ে বক মরে, আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে।' যেমন রাজ্যের গত নির্বাচনে তৃণমূলের সফলতার জন্য বাহবা পেয়েছেন পিকে। এত ডামাডোলে মধ্যেও কি রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরাতে পেরেছে তাঁর স্ট্রাটেজি। যদি বলেন উপনির্বাচনের ফল, তাহলে বলব চিরকাল উপনির্বাচনের সিংহভাগের ফলাফল বিচার করলে দেখা যাবে, সেটি শাসক দলের পক্ষেই যায়। যদি কেউ উপনির্বাচনকে নিয়ে উৎসাহিত হন, তাহলে বলব, ভবানীপুরে শতাংশের হিসেবে অর্ধেক মানুষ ভোটে অংশ নিয়েছেন। আর সেখানে স্থানীয় সূত্র জানাচ্ছে ভোটে জেতার জন্য অনৈতিক ছল ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে শাসক দলের সুপ্রিমোর ন্যূনতম সম্মান তাঁর বাড়ির উঠানে রক্ষা হয়। হয়েছে রক্ষা।

রাজ্যের শাসক দল চলেছে গোয়ার ও ত্রিপুরার ক্ষমতা দখলে। এই তিন রাজ্যে জিতে তিনি হবেন দেশের প্রজেক্টেড প্রধানমন্ত্রী। আচ্ছা, এই দুটি রাজ্যের নির্বাচনের ইস্তেহারে কী প্রতিশ্রুতি দেবেন তারা? এই রাজ্যের মতো ওই রাজ্যের মানুষের কাছে কর্মসংস্থানহীন রাজ্যের প্রতিশ্রুতি, নাকি ১১ বছরের সামগ্রিক ভাবে অনুন্নয়নের চিত্র তুলে ধরবেন? ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যে মানুষকে সামান্য সরকারি সাহায্য, মানে সরকারি ভিক্ষা দিয়ে ভিখারি শ্রেণীতে পরিণত করেছেন মা-মাটি-মানুষের সরকার। ওই রাজ্যগুলিতেও কি ওই ভিক্ষা দিয়ে গিমিকের রাজনীতির গেম খেলবে তৃণমূল? আমাদের রাজ্যের সংস্কৃতিতে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, দলবাজি মজ্জাগত হয়ে গেছে। আর সাধারণ মানুষ অবহেলিত চরিত্রের অধিকারী হয়ে মুক ও বধির সদৃশ—প্রতিবাদ জানাবার জায়গা যেমন নেই, তেমনি নেই আন্দোলন করার অধিকার। সেই পরিবেশ রচনা হবে কি ওই রাজ্যে? সরকারি কর্মচারীরা ডিএ পান না, শিক্ষকরা যোগ্যতা মান পেরলেও সেই যোগ্যতায় প্রাথমিক শিক্ষকরা উপযুক্ত বেতন পান না, উলটে মার খান। ওখানকার সরকারি কর্মী শিক্ষকরা কি সেই বার্তা পেয়েছেন? বাজারে নেই কোনো নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণহীন বাজার প্রতিষ্ঠা করবে তৃণমূল? করোনা অতিমারিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো সাহায্যকে হয় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি, নয়তো নিজেদের প্রকল্প বলে চালিয়ে দেবার রাজনীতি করেছে এই সরকার। ওই রাজ্যগুলিতে গিয়ে কি এই ধরনের প্রজেকশন দেবে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল? তবুও তৃণমূল সুপ্রিমোর দিবাস্বপ্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। দেখুন ক্ষতি নেই। তবে দয়া করে রাজ্যের মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে নয়।

বাংলাদেশের হিন্দুদের সাংবিধানিক পরিচয় নিশ্চিহ্ন হবার মুখে

আনন্দ দেবশর্মা

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে পাকিস্তানে পূর্ববঙ্গে হিন্দুরদের দ্বিতীয় নাগরিক করে রাখা হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই দেশটির সাংবিধানিক পরিচয় হলো ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা। ফলে হিন্দু জনগোষ্ঠী সমান নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। সামাজিকভাবেও এত সূক্ষ্মভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে হিন্দুরা যে এটা খালি চোখে দেখা যায় না, শুধু এই অনুভবের জন্য নিজেকে হিন্দু হয়ে দেখতে হবে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর শেখ মুজিবুর রহমান নতুন বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৭২ সালে শাসন পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেটা অতি স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল। ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হলে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশে পরিণত হয়।

সামরিক অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় আসেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি ক্ষমতায় এসেই বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূল স্তম্ভের অন্যতম উপাদান ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে সংবিধানকে পঞ্চমবারের মতো সংশোধন করে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল সংবিধানের মুখবন্ধে যুক্ত করে দিলেন দেশের সরকারি ধর্ম হবে ইসলাম। পরবর্তীতে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসলেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি ক্ষমতায় এসেই সংবিধান কেটেছিঁড়ে ৮ম সংশোধনীতে অনুচ্ছেদ ২ (ক) ধারা যুক্ত করে ইসলামকে বাংলাদেশের সরকারি ধর্ম ঘোষণা করলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য সান্ত্বনার মলম হিসেবে আরেকটা লেজুড় জুড়ে দিলেন— 'তবে বাংলাদেশে অন্য ধর্মের লোকেরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করতে পারবে'।

পরবর্তীতে ২০১১ সালে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে সংবিধানে ইসলামকে সরকারি ধর্মের মর্যাদায় বহাল রেখেই ধর্মনিরপেক্ষতার এক অদ্ভুত মিশেল তৈরি করলেন, কিন্তু সংবিধানের মুখবন্ধেরও কোনো পরিবর্তন করলেন না। সরকারি ভাবে একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার কারণে অন্যান্য ধর্মের চর্চা হয়ে গেল সংকুচিত এবং সেই ধর্মের অনুসারীরা হয়ে গেলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

শুধু তাই নয়, ১৯৯৩ সালে বিএনপি সরকার কিছু বৈষম্যমূলক আইন তৈরি করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয় হিন্দুরা যাতে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে না পারে এবং ভারতের সঙ্গে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে হিন্দুদের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

১৯৩৭ সালের হিন্দু আইন অনুযায়ী মেয়েরা কোনোরকম সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়। তবে বিধবা হওয়ার পর সন্তান নাবালক থাকা অবস্থায় শুধু বসতবাড়ির অধিকারী হয়। দীর্ঘ ৮৩ বছরেও এই আইনের আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা করে বলেছে, হিন্দু বিধবারা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, তবে অর্পিত সম্পত্তি কোনো প্রকার বিক্রি, হস্তান্তরযোগ্য নয়, শুধু ভোগদখলকৃত বলে গণ্য হবে। একজন নারী বিধবা হওয়ার পর স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হবে। লিখিত নয়, শুধুমাত্র ভোগ করতে পারবেন। তাহলে কি আমরা বলব, কোনো নারীর যদি সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার বাসনা মনে থাকে, তাহলে তাকে বিধবা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?

বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তাহীন জীবনযাপনে আগুনে ঘি ঢালে সরকারের আইন ব্যবস্থা। তাদের ভঙ্গুর জীবনের মতোই তাদের সহায় সম্পত্তিও নিরাপদ নয়। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি নামের এক হিংসাত্মক আইন পাশ করে। ফলে রাতারাতি দেশের হিন্দুদের সম্পত্তি হয়ে গেল শত্রু সম্পত্তি। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যেসব পাকিস্তানি নাগরিক পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে ভারতে চলে গিয়েছিলেন, তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালে শত্রু সম্পত্তির নতুন নাম দেওয়া হয় 'অর্পিত সম্পত্তি'। সরকার দুটি ক্যাটাগরিতে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা করেছে। এর মধ্যে 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি সরকারের দখলে রয়েছে বা ইজারা দেওয়া হয়েছে। আর 'খ' তালিকার সম্পত্তি সরকারের দখলে বা ইজারায় নেই। সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬০ হাজার একর। এর মধ্যে প্রত্যর্পণযোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য সরকারের দখলে থাকা 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৬২ একর। আর সরকারের দখলের বাইরে 'খ' তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৫৮ একর।

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর শত্রু সম্পত্তি আইনকে নতুন বোতলে পুরনো মদের মতো অর্পিত সম্পত্তি নামে পরিবেশন করা হয়। অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তি বৈধ মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ বা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ২০০১ সালে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে জবরদখল করে নেওয়া সম্পত্তি আর হিন্দুদের ফেরত দেওয়া হয় না। একটা দেশের আইন কীভাবে নাগরিকের জীবন সংকুচিত ও দুর্বিসহ করে দিতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ শত্রু সম্পত্তি তথা অর্পিত সম্পত্তি আইন। হিন্দু জনগোষ্ঠী নিজেদের সম্পত্তি নিজেরাই ভোগের ক্ষমতা হারায়।

প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু পরিবার শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তি আইনে দুর্ভোগের শিকার। হিন্দু জনগোষ্ঠী এদেশে প্রায় ২০ লক্ষ একর ভূসম্পত্তি হারিয়েছেন। সব সরকারের আমলেই হিন্দুদের ভূসম্পত্তি জবরদখল হয়েছে কিন্তু বিএনপির ২০০১ আমলে তার মাত্রা ছিল সীমাহীন। সরকার পরিবর্তন হলেও নির্যাতনের মাত্রার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাসের পাতা ওলটালে তখন দেখা যাবে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর লাগাতার পরিকল্পিত আক্রমণের পিছনে রয়েছে একটিমাত্র কারণ। কারণটি হচ্ছে— 'এথনিক ক্লিনজিং' অর্থাৎ বাংলাদেশকে সংখ্যালঘু-শূন্য একটি দেশে পরিণত করা। এরা প্রকৃতপক্ষে চায় না বাংলাদেশে একটিও হিন্দু পরিবারের অস্তিত্ব থাকুক। তাইতো চলছে ধারাবাহিক আক্রমণ। চলছে বৈষম্যমূলক আচরণ। চলছে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুরের মতো ঘটনা।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনগণনা হয় ১৯৭৪ সালে তখন মোট জনসংখ্যার ১৩.৫ ছিল হিন্দু জনসংখ্যা। এরপর ১৯৮১ সালের ১২.১ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ১০.৫, ২০০১ সালে ৯.৩ এবং ২০১১ সালে সর্বশেষ আদমশুমারিতে ৮.৫ শতাংশ হিন্দু জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়। আর এতে স্পষ্ট যে স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে কমেছে। আর এই সময়ে মুসলমান জনগোষ্ঠী বেড়েছে। ১৯৭৪ সালে শতকরা ৮৫.৪ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে ৯০.৪ শতাংশ হয়েছে। তবে এই সময়কালে বৌদ্ধ ০.৬ ও খ্রিস্টান ০.৩ ভাগ ছিল। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ০.২ থেকে ০.৩ ভাগ এর মধ্যে। এই হিসাবটি সরাসরি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসেব থেকে পাওয়া। এই হিসেবে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কমেনি, একই আছে। বাংলাদেশে প্রতি ১০ বছর পর জনগণনা হয়। ২০২১ সালের জনগণনার রিপোর্ট এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। এটা হবে ষষ্ঠ জনগণনা বাংলাদেশের। তবে এক্ষুনি বলা যায়, এই জনগণনা রিপোর্টেও হিন্দু জনসংখ্যা আরো কমবে।

এছাড়াও, আধুনিক বিশ্বে বিবাহের আইনসিদ্ধ প্রমাণ রক্ষার্থে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো আইন নেই। নতুন প্রস্তাবিত আইনে এটিকে স্বেচ্ছামূলক করে রাখা হয়েছে। শুধু তা নয়, বাংলাদেশে প্রচলিত সনাতনী আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি নেই। অন্যদিকে বহুবিবাহ অনুমোদিত। অর্থাৎ বহুবিবাহ ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে অবৈধ নয় এবং সরকারি আইনেও শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ নয়।

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট বাংলাদেশে হিন্দুদের করুণ পরিণতিতে সে দেশের সরকার এবং প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদত আছে। অন্যথায় মাত্র পাঁচ দশকে হিন্দুদের অবস্থা এতটা খারাপ হতো না। ▯

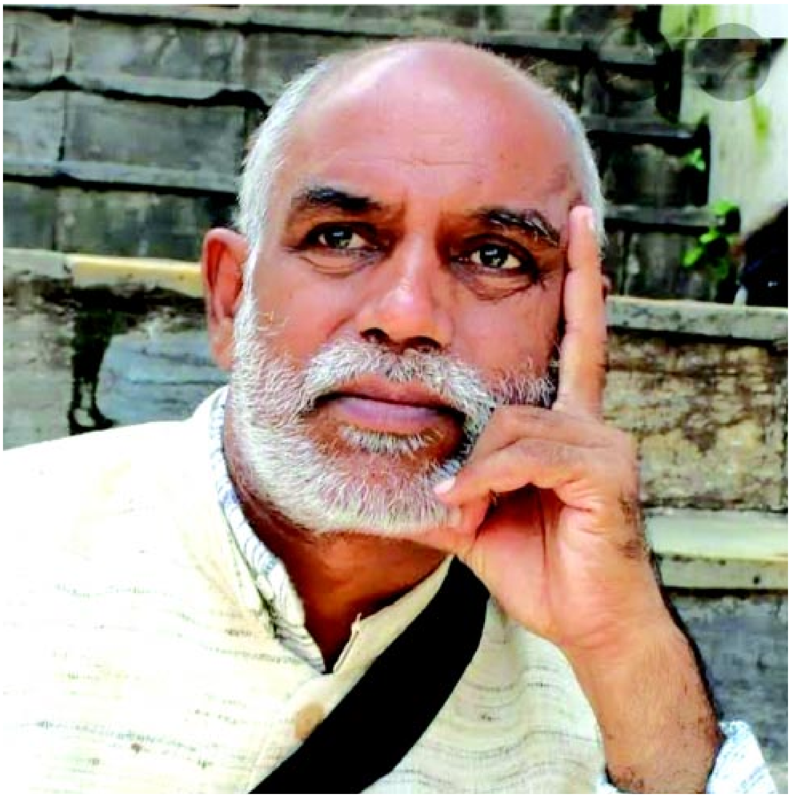

বিমুক্তির পথের দিশারি আমীরচাঁদ অমৃতলোকে

তিলক সেনগুপ্ত

নমন ১৮৫৭। উত্তরপ্রদেশের বিঠুর। ছোটো গ্রাম। ঐতিহাসিক সেই কেল্লা আজও সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে রুটি ও পদ্ম ফুল নিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধের সংকল্প করেছিলেন তাঁতিয়া টোপি, বাহাদুরশাহ জাফরের মতো যোদ্ধারা। সেই স্থানেই অনুষ্ঠানের যোজনা করলেন তিনি। প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে অনুষ্ঠান সফল করাই তাঁর লক্ষ্য। তার জন্য নিলেন সংকল্প। সারা দেশ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্মভূমি, কর্মভূমির মাটি মাথায় নিয়ে সকলেরই গন্তব্য বিঠুর। ওই সমস্ত ঐতিহ্যবাহী স্থানের মাটি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ভারতের নদ-নদীর জল সঞ্চিত করে একীভূত করা হলো। শুরু হলো তিন দিনের ঐতিহাসিক কার্যক্রম। যিনি এই কার্যক্রমের যোজনা তৈরি করলেন তিনি এক তরতাজা প্রাণবন্ত এক সঙ্ঘ প্রচারক। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করলাম, কখনও তিনি মঞ্চে উঠলেন না। অনুষ্ঠান চলাকালীন পায়ে চটি পরলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করলাম! উত্তর এল, ‘সংকল্প আছে। মঞ্চে অনুষ্ঠান চলাকালীন চটি পরব না।’ মঞ্চকে এমন মর্যাদা কেউ দিয়েছেন? যিনি দিয়েছেন, দিতে শিখিয়েছেন তিনিই আমীরচাঁদজী। একেই বোধহয় বলে সংকল্প! সারা জীবন যিনি সংকল্প ও লক্ষ্য থেকে সরে যাননি।

১৯৬৫ সালের ১ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে হনুমানগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অবোধকিশোর ও মাতা গুলজারিয়াদেবী। সাত ভাই বোনের মধ্যে ষষ্ঠ সন্তান আমীরচাঁদ ছোটোবেলা থেকেই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন। স্কুল জীবনেই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আচার- অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই আকর্ষণেই স্কুল জীবনে সঙ্ঘের শাখায় যাওয়া শুরু করেন। ১৯৮৫ সালে সংস্কার ভারতী পূর্ব- উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সেই শুরু, তারপর থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ আমীরচাঁদ। দায়িত্ব বাড়ল। সংস্কার ভারতীয় অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন। কাজও গতি পেল। ঠিক এমনই সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর চরম আঘাত এল।

কাশীর গঙ্গাঘাটে দীপা মেহেতা ‘ওয়াটার’ সিনেমার সেট তৈরি করে শুরু করলেন শুটিং। যে সিনেমার চিত্রনাট্যে কাশীতে দেবাদিদেব মহাদেবের চরণপ্রান্তে আশ্রয় নেওয়া ভারতের বিধবা রমণীদের ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এহেন ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিরোধী সিনেমার প্রতিবাদে প্রথম গর্জে উঠল সংস্কার ভারতী। সারা বারাণসী জুড়ে শুরু হলো জনজাগরণ। যে আন্দোলনের নেপথ্য নায়ক আমীরচাঁদ। আন্দোলন যখন বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে, তখন কাশীর উপর দিয়ে ট্রেনে করে প্রবাসে যাচ্ছেন সঙ্ঘের সরকার্যবাহ এইচ.ভি. শেষাদ্রিজী। খবর পেয়ে ছুটলেন আমীরচাঁদ।

এক মিনিটের জন্য ট্রেন থামল স্টেশনে। শেষাদ্রিজী জানলা দিয়ে আমীরচাঁদকে ইঙ্গিত করলেন, ‘ওরা এখনও আছে কেন?’

সঙ্ঘের ইশারা মিলতেই জনজাগরণকে গণআন্দোলনে পরিণত করলেন আমীরচাঁদ। সংস্কার ভারতীর প্রবল আন্দোলনের চাপে সেদিন দীপা মেহেতাদের শুটিং বন্ধ করে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। তখন এমনই চাপ তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রেও। আমীরচাঁদজীর নাম উল্লেখ করে বড়ো বড়ো খবর

হয়েছিল।

সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী বহু আগেই সতর্ক করে বলেছিলেন, 'পূর্বোত্তর জ্বলছে, সতর্ক হও।' সেই থেকে সঙ্ঘ ও সংস্কার ভারতীর লক্ষ্য হয়ে উঠল 'দৃষ্টি পূর্বোত্তর'। সংস্কার ভারতীর সংরক্ষক বাবা যোগেন্দ্রজী বিশেষ নজর দিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর নির্দেশেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ছুটলেন আমীরচাঁদ। কারণ খ্রিস্টান মিশনারিদের মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে তখন ভারত-বিরোধী শক্তি অতি সক্রিয়। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার দিয়ে লড়াই শুরু করলেন আমীরচাঁদ। ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে আমীরচাঁদজী পূর্বোত্তরের শিল্পী কলাকুশলীদের ভিশন দিলেন— 'আমাদের সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়।' অসম, মিজোরাম, অরুণাচল, ত্রিপুরা, মেঘালয়, সিকিমের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকেই অগ্রাধিকার দিতে শুরু করলেন আমীরচাঁদ। আর তাতেই আপন হয়ে উঠলেন জনজাতি সমাজের মধ্যে। প্রবল প্রতিকূল আবহাওয়া, বিপরীত আহার, কিন্তু পিছু হটেননি তিনি। ভিত শক্ত হতেই ২০০৩ সালে রঙ্গোলি বিহুর প্রকাশ্য অনুষ্ঠান। নববর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো গুয়াহাটিতে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে। নতুন সূর্যকে সাক্ষী রেখে নদী বক্ষে অর্ঘ্য প্রদান করলেন ভারত বিখ্যাত শিল্পীরা। ভূপেন হাজারিকা, অনুপ জলোটা আরও কত নাম। এক অপূর্ব ভাবনা! রূপকার আমীরচাঁদ। এহেন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের ফলে সম্পূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল সংস্কার ভারতী।

কলকাতার কেশব ভবনকে কেন্দ্র করেই আমীরচাঁদজী উত্তর- পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের পাহাড়-পর্বত চষে বেড়িয়েছেন। খুঁজে বার করেছেন প্রাচীন জনজাতির অপূর্ব সব শিল্পকলা। তাদের সংস্কৃতিকে এই প্রথম কেউ মর্যাদা দিল। এমনই অনুভব করতে শুরু করল নাগাল্যান্ড মিজোরামের অরণ্য-অধ্যুষিত মানুষেরা, যাদের কথা কেউ মনে রাখেনি তাদের আবার সংস্কৃতি! তাদের শিল্প ধারাকে আমীরচাঁদের উদ্যোগেই পৌঁছে দেওয়া হলো দেশের জাতীয় রাজধানীর রাজপথে। সালটা ২০০৫, পূর্বোত্তরের শিল্পীদের নিয়ে এসে মঞ্চ দিলেন নতুন দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন প্রাঙ্গণে। সংগীত, নৃত্য, বাদ্যে পরিপূর্ণ পূর্বোত্তরের সংস্কৃতি ও ভারতীয় যে সংস্কৃতি তা অনুধাবন করালেন সংস্কার ভারতীর মাধ্যমে। সালটা ২০১১, পূর্বোত্তরের সাত রাজ্যের ৫ হাজার প্রতিভাবান শিশুশিল্পীকে নিয়ে 'বাল কলা সঙ্গম'-এর রূপকার আমীরচাঁদ।

সবসময় সৃষ্টিশীল, অভিনব, অপূর্ব সব ভাবনাচিন্তা মাথায় খেলত তাঁর। তাই তো 'অ্যায় মেরে বতনকী লোগো, জরা আঁখমে ভরলো পানি।' এই একটি গানকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রাণপ্রিয় রাজ্য অরুণাচলের ইটানগরে কার্যক্রমের যোজনা তৈরি করলেন তিনি। নাম দিলেন 'শরহদ কী স্বরাঞ্জলি'। ১৯৬২ সালে চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধেই এই কার্যক্রমের পরিকল্পনা। ওই যুদ্ধের বীরগতিপ্রাপ্ত পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা। নতুন প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেওয়া যে, এই দেশের জন্য তোমাদের পূর্বজরা প্রাণ বলিদান দিয়েছেন। সারা অরুণাচল জুড়ে একদিনে এক সময়ে গীত হয়েছিল লতাজীর সেই বিখ্যাত গান। বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতবাদের সরকার ছিল সেখানে কিন্তু সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে ততোধিক দৃঢ়চেতা ছিলেন আমীরচাঁদজী। শত বাধা সত্ত্বেও সফল হলেন। সংস্কার ভারতীর প্রভাবে তৎকালীন অরুণাচল সরকার স্থায়ী সংগ্রহশালা তৈরি করলেন ইটানগরে।

কিন্তু এর মাঝেই কলকাতায় তাঁর কেন্দ্র হওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কাজের বিস্তারের জন্য শাখায় শাখায় প্রবাস করেছেন। নিজেকে বাঙ্গালি করে তুলেছিলেন। বাংলা বলা, বোঝা কোনোটাতেই অসুবিধা হতো না তাঁর। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি, শাখার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। ২০১৪ সালেই তাঁর কেন্দ্র বদল হলো। দিল্লি গেলেন। দেশ জুড়ে রাষ্ট্রবাদী ভাবনার শিল্পী কলাকুশলীদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুললেন। সভাবসিদ্ধ বন্ধুত্বে ওইসব প্রতিভাবান, জগতবিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে সংস্কার ভারতীর কাজে জোয়ার আনলেন তিনি। ২০১৮-তে দিল্লিতে আয়োজিত অখিল ভারতীয় সাধারণ সভায় আমীরচাঁদজীর হাতেই তুলে দেওয়া হলো সারা ভারতের সংগঠনের নেতৃত্বভার। তিনি অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে এলেন।

দেশ যখন ভয়ংকর করোনা অতিমারীর কারণে বিধ্বস্ত তখন স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষে উৎসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন। দেশ জুড়ে প্রবাস শুরু করলেন আমীরচাঁদজী। সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা অরুণকুমারজী, নন্দকুমারজী ও আমীরচাঁদজী সারা দেশ ঘুরে ঘুরে বৈঠক করলেন। কত পরিকল্পনা, ভাবনা প্রস্তুত ছিল তাঁর। দেশ জুড়ে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবকে প্রভাবী করে তুলতে শুরু করেছিলেন সুচারু পরিকল্পনা। সংস্কার ভারতীর সংগঠনের ভিতরে একাধিক পরিবর্তন আনলেন তিনি। আরও যুগোপযোগী করে তুললেন প্রিয় সংগঠনকে।

হিমালয়ের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ ছিল তাঁর। অরুণাচল যে তাঁর বড়ো প্রিয় জায়গা। পাহাড় ঘেরা প্রতিটি গ্রাম তাঁর চেনা। জনজাতির মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠতেন বার বার। সেই পূর্বোত্তরের অমোঘ আকর্ষণেই ফের গেলেন নাগাল্যান্ড, অসম হয়ে অরুণাচল। পৌঁছলেন তাওয়াং। সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন আমীরচাঁদজী।

দেশমাতৃকার সেবক দেশরক্ষায় অরুণাচলেই রয়ে গেলেন। ১৬ অক্টোবর ২০২১, দেশ হারালো ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় জীবন সমর্পিত, কলাসেবী, সংস্কৃতি সংরক্ষক আমীরচাঁদকে। আমরা হারালাম আমাদের প্রিয় আমীরচাঁদজীকে। ▯

ভারতীয় রাজনীতিকদের পেশা রাজনীতি

ভারতীয় রাজনীতি হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ পেশা— এর মূলধন হলো যে কোনো ভাবে 'সেলিব্রেটি' হওয়া। কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি সম্প্রতি বাবুল সুপ্রিয়ের মতো ধূর্ত একটি প্রতিরূপের দর্শন করে। 'ল্যাং'মারাও রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি প্রথাগত মানসিকতা--- সে ডান-বাম সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত। রাজনীতি দেশের স্বার্থে করা উচিত, ব্যক্তি স্বার্থে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তাম--- এক তথাকথিত বামপন্থী— যে শুধুমাত্র রাজনীতি বলতে এসএফআই-ই বুঝত— পড়াশুনা কখন করত আমরা কখনো বুঝতেও পারতাম না, সে বলেছিল, বোকা বা মূর্খরাই 'ক্ষুদিরাম' হওয়ার লোভে দেশ-অন্ত প্রাণ হয়। (একান্ত আপনভাবে কথাটা বলেছিল) আসলে মানুষ হয়ে জন্মে যদি ভোগবাদে বিশ্বাসী না হও, তাহলে করলেটা কী? বাবুল সুপ্রিয়-র দ্বিতীয় বিবাহটিও সেই একই কারণে। গত বছর ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি রদ্রিগো দুতের্তে ভারতে এসে ভারতীয় সাংসদদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করেন এবং তাঁদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কী করেন? তিনি দুই বা তিনবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ভারতীয় সাংসদরা ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতির প্রশ্নটি অনেকেই বুঝতে পারেননি। তারপর তিনি প্রশ্নটি পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করেন আপনার আয়ের উৎস কী? প্রায় সমস্ত সাংসদ বলেন আমাদের আয় রাজনীতির মাধ্যমে। এর মাধ্যমে বেতন, ভাতা এমনকী পেনশন পর্যন্ত পাওয়া যায়। রদ্রিগো দুতের্তে আশ্চর্য হন যে এতজন সাংসদ, মন্ত্রী, এমনকী রাষ্ট্রপতিও একটি উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেবল বেতন ও ভাতার উপর নির্ভরশীল এবং এই অর্থ জনগণের কাছ থেকে ট্যাক্স হিসেবে আদায় করা হয়। তারপর তিনি হালকা হেসে বললেন, তাঁর আয়ের উৎস হলো কৃষি। পেশায় তিনি একজন কৃষক। তিনি বলেছিলেন যে প্রতিদিন সকালে ৫টায় তিনি খামারে পৌঁছান এবং তাঁর খামারের কাজ সম্পন্ন করার পর ৯টায় ফিরে এসে রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম কখনই এই সংবাদ প্রচার করবে না।

—**দীপক খাঁ,**
পাটপুর, বাঁকুড়া।

রাজনীতিতে চারিত্রিক গঠন প্রয়োজন

অনেক মানুষের কাছ থেকে অনেক সময়ই এই অভিযোগটি শুনতে পাওয়া যায় যে বিধায়ক, সাংসদ হওয়ার জন্য কোনোরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। একটি কেরানির চাকরি পেতে গেলেও অন্তত স্নাতক হওয়া আবশ্যক। বিধায়ক বা সাংসদ হওয়ার জন্য মানুষের ভোটদানের মাধ্যমে সমর্থনই শেষ কথা, সেক্ষেত্রে আলাদা করে মানুষের সেবা কিংবা মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা নেই— এটি আমাদের দেশের সংবিধানের বর্ণিত রয়েছে। ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান। কথায় আছে এই পৃথিবীর কোনো মানুষ কিংবা কোনো মহামানবের পক্ষে ভারতীয় সংবিধান এক দিনে পড়ে শেষ করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে আমরা বিষয়ের শিরা থেকে উপশিরায় আসি। শিক্ষাগত যোগ্যতা বাদ দিলে, বাকি পড়ে থাকে মানুষের চরিত্র, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গঠন ও উন্নয়ন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে কিংবা দক্ষ রাজনীতিবিদ হতে গেলে চারিত্রিক গঠনের কি আদৌ প্রয়াজনীয়তা আছে? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর তর্কসাপেক্ষ ও ব্যক্তিগত, তবুও সংবিধানের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করেই এই বিষয়ে বলা যায় যে, লোকসভা হোক কিংবা বিধানসভা কিংবা পাড়ার মোড়ে গজিয়ে ওঠা নতুন দলীয় কার্যালয়, প্রত্যেকটি জায়গায় জনপ্রতিনিধিত্ব করতে গেলে সর্বপ্রথম যে জিনিসটির প্রয়োজন হয় তা হলো স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং এলাকার বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি না থাকলে মানুষের কাছে ওই জনপ্রতিনিধির গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। কোনোভাবে জনগণ যদি সেই এলাকার বিধায়ক, সাংসদ কিংবা এলাকার জনপ্রতিনিধির প্রতি আস্থা হারাতে শুরু করে তাহলে দেশজুড়ে, রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের বন্যা বয়ে গেলেও সেই এলাকার আক্ষরিক অর্থে ছোটো ও মাঝারি মাপের সমস্যার সমাধান কখনোই সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ গরিব কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষগুলি কখনোই ছোটো ছোটো সমস্যার সমাধান করবার জন্য অস্বচ্ছ জনপ্রতিনিধির কাছে গিয়ে আর্থিক সহযোগিতার নামে চাপ কিংবা কখনো অপ্রয়োজনীয় সাময়িক দাসত্বের শিকার হওয়ার মতো সমস্যা থেকে জীবন ধারণ করাকে বেশি প্রাধান্য দেবে।

প্রত্যেকটি জনপ্রতিনিধি এই দেশে অযোগ্য, চারিত্রিক সমস্যায় জর্জরিত ও দুর্নীতিপরায়ণ এমনটাও নয়। অনেক সময় দেখা যায়, অতিরিক্ত যোগ্যতা কিংবা অতিমাত্রায় জনপ্রিয়তা থাকার কারণে প্রায় সব রাজনৈতিক দল থেকেই বিভিন্ন ভোটে অভিনেতা, খেলোয়াড়, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ শিক্ষক যাদের রাজনৈতিক বিষয়ে কিংবা সেই এলাকার মানুষের দুঃখ দুর্দশা কিংবা প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের বিষয়ে কোনো সঠিক ধারণা না থাকায় তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় এবং গরিব, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষেরা ওই জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছতে অনিহা দেখায়।

সাংসদ, বিধায়ক, জেলা, রাজ্য কিংবা ব্লক স্তরের নেতা-কর্মী, এমনকী সক্রিয় সমর্থকদেরও চারিত্রিক বিকাশ এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি আবশ্যক রয়েছে। প্রাথমিক স্তরে কর্মী-সমর্থকদের কার্যকলাপ, কথাবার্তা, জীবনধারণ, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব এবং সর্বোপরি নিস্বার্থভাবে উপকার বা সেবাদানের মানসিকতা, সাধারণ নিরপেক্ষ

ফঃ ৩

মানুষদের আকৃষ্ট করে, তারপর দ্বিতীয়স্তরে জেলা বা রাজ্যের নেতা বা জনপ্রতিনিধির ভাবমূর্তি ও সুস্থ স্বাভাবিক বক্তব্যের দ্বারা মানুষ দ্বিতীয়বার আকৃষ্ট হয়, আর সর্বশেষে প্রার্থীর আচার-আচরণ, ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্বের কারণে প্রভাবিত হয়ে তাকে নির্বাচিত করে।

কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাধ্যমে রাজনীতির দ্বারা সমাজে কি সুপ্রভাব ফেলা সম্ভব? স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কোনোভাবে যদি স্বচ্ছ ও উন্নততর মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব ঘটে, তখন সাধারণ মানুষ সেই মানুষটাকে দেখে উন্নয়নের আশায় বুক বাঁধে। বিভিন্ন সময়ে মানুষকে জীবনধারণের নতুন পথ দেখাতে এবং মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে, মানুষের অধিকারের কথা বলতে এই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আগমন হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মনীষী মানুষকে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন, মানুষকে নিজের অধিকারের কথা বলতে শিখিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানে সেই তুলনায় স্বচ্ছ ব্যক্তিত্বের মানুষ রাজনৈতিক স্তরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই স্বচ্ছ ব্যক্তিত্বের মানুষের আগমন ঘটলে, সেই মানুষের দ্বারা রাজনীতির মাধ্যমেই সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটবেই। সামাজিক উন্নয়ন এবং বিকাশের ফলেই মানুষের মধ্যে বাড়বে আত্ম সচেতনতা। সমাজের বুকে মানুষের আত্মসচেতনতা জাগ্রত করা সম্ভব হলেই স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক হিংসা ও হানাহানি যথেষ্ট হ্রাস পাবে।

আগামীদিনে রাজনৈতিক স্তরে এই মুহূর্তে প্রশিক্ষিত চরিত্র সম্পন্ন, জনদরদি শৃঙ্খলাবদ্ধ জনপ্রতিনিধিদের ভবিষ্যতে দেখতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সঠিক মানুষকে চয়ন, ভোটপ্রদান এবং রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে নিজের ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন, বিকাশ এবং একটি সুষ্ঠু অনুশাসনে জীবনধারণ উপরোক্ত তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। সর্বশেষে, সাধারণ নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক মানুষ হিসেবে আমরা যদি সচেতন হই এবং প্রত্যেকটি দলের জনপ্রতিনিধিদের ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করতে শুরু করি, তাহলে রাজনীতির আঙিনায় নতুন সূর্য এবং সেই সূর্যের আলোয় আমাদের সমাজে অবশ্যই আশার আলো দেখা যাবে।

—চন্দনেশ্বর সেনগুপ্ত,
ঘোড়াধরা, ঝাড়গ্রাম।

শরণার্থীর আড়ালে জঙ্গিরা থাকতে পারে

প্রায় কুড়ি বছর পর আফগানিস্তানের মাটিতে কোনো মার্কিন সৈন্য নেই। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কথা রেখেছেন। শেষ ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার পর হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, প্রায় ৬ হাজার মার্কিনিকে কাবুল থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পেন্টাগন আনুষ্ঠানিক ভাবে দীর্ঘস্থায়ী আফগান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। যারা আফগানিস্তান ছাড়তে চায় জাতিসঙ্ঘ তাদের সেই সুযোগ দেওয়ার জন্যে তালিবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশ করেছে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন বলেছেন, এবার 'নতুন অধ্যায়' শুরু হবে।

মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে তালিবানরা উৎসবে মেতে ওঠে, তাঁরা এটি 'ঐতিহাসিক ক্ষণ' এবং 'পূর্ণ স্বাধীনতা' বলে মন্তব্য করেন। মার্কিন সেনা নেই, এখন দেখা যাবে তালিবানের আসল চেহারা। কাবুলে সরকার গঠন অতীত থেকে সুশিক্ষা না নিলে তালিবানের এ বিজয় 'মলিন' হতে বেশি সময় নেবে না? অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কথা ইতিমধ্যে মিডিয়ায় এসেছে। ক্ষমতার কাছাকাছি দুই গ্রুপ— জঙ্গি তালিবান ও বিদেশ,বিশেষত কাতার থেকে আগত গ্রুপ। দেখা যাক কী হয়!

কী ঘটবে আফগানিস্তানে? উত্তর এ মুহূর্তে সবার অজানা। এর আগে কাবুল বিমান বন্দরে হামলার দায় আইসিস স্বীকার করেছে। হোয়াইট হাউস বলেছে, আমরা ভুলবো না, ক্ষমা করবো না, প্রতিশোধ নেবো। কিছুটা প্রতিশোধ নিয়েছেন, দুই জঙ্গিকে ড্রোন আক্রমণে নিহত করেছে, গোলাবারুদ বোঝাই একটি ট্রাক ধ্বংস করেছে। তাতে কি কাজ হবে? বাইডেন প্রশাসন চাপে আছে। বাইডেনের সমর্থন এখন ৪০ শতাংশের নীচে। কথায় বলে, 'সিংহ যখন পিছু হটে, বানর তখন ঢিল মারে'। যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে এসেছে, তালিবানদের বীরত্ব এখন 'নিরীহ আফগান ও নারীর' ওপর প্রদর্শিত হচ্ছে?

ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল এইচ আর ম্যাকমাস্টার বলেছেন, 'সবে তো শুরু'। আমেরিকা বলেছে, তাঁরা নজর রাখছে। নজর তো সবাই রাখছে। তালিবানরা কী কট্টরপন্থী হবে, না মোটামুটি একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, সেই অনুপাতে বিভিন্ন দেশ পদক্ষেপ নেবে। তালিবানরা উৎসব করছে, আফগানরা 'শরিয়ার ভয়ে' পালাচ্ছে। তালিবান মুখপাত্র বলেছেন, ৯/১১ টুইন-টাওয়ার ধ্বংসে বিন-লাদেন জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ নেই। এতে কি কিছু বোঝা যায়? লক্ষণীয় যে, তালিবান কাবুল বিমান বন্দর বোমা-বিস্ফোরণকে 'সন্ত্রাসী আক্রমণ' বলে মন্তব্য করেছে।

পাকিস্তান তালিবান উত্থানে উৎফুল্ল। ইমরান খানের ক্ষমতাসীন পার্টির নেত্রী নিলম বলেছেন, তালিবানরা কাশ্মীর ছিনিয়ে এনে আমাদের দেবে। জোশে তিনি আরও বলেন, ভারত পাকিস্তানকে দু'টুকরো করেছিল, আবার তা জোড়া লাগবে। আমরা তাঁর এ বক্তব্যের নিন্দা করি ও প্রতিবাদ জানাই। কাবুল বিমানবন্দরে নিহতদের মধ্যে নাকি ২৮ জন তালিবান। প্রশ্ন হচ্ছে, আমেরিকা ও উন্নত বিশ্ব এবং ভারত 'মানবিক কারণে' যে আফগানদের শরণার্থী হিসেবে নিজদেশে আদর-যত্ন করে ঘরে তুলছে, তাদের মধ্যে কি তালিবান নেই? রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুটিন কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন, শরণার্থীর আড়ালে জঙ্গি থাকতে পারে, তাই তাঁরা আফগান শরণার্থীদের আশ্রয় দেবে না।

—শিতাংশু গুহ,
নিউইয়র্ক।

অনামিকা দে

কাকু, একটু সরে দাঁড়াবেন প্লিজ— ইন্দ্রাণী বলল, একবার দুবার। অথচ কোনো কিছুই যেন কানেই গেল না 'কাকু' সম্বোধনের লোকটির। দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী থেকে প্রতিদিনই এই সময়ে অর্থাৎ ৯টা চল্লিশ মিনিটের ২০৫ নম্বর বাসটি ধরে ধর্মতলায় যায় ইন্দ্রাণী, আজও প্রতিদিনের মতো সকালের টিউশন পড়িয়ে বাড়ি গিয়ে কোনো রকমে স্নান খাওয়া করেই বেরিয়ে এসেছে এই বাসটা ধরবে বলে। ঠিক সাড়ে দশটার আগে পৌঁছতে হবে অফিস নইলে ডাক পড়বে ম্যানেজারের ঘরে। আসলে ওটা একটা

ইভটিজাররা নানান কৌশলে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে থাকে

ছুতো, সারাদিনে কারণে অকারণে অনেকবারই ডাক পড়ে ওই ঘরে। ইদানীং প্রতিদিনের রোজনামচায় কিছু অনভিপ্রেত ঘটনাও যেন এখন ধারাবাহিকতার রূপ নিয়েছে।

সকাল ঠিক সাড়ে সাতটায় ক্লাস টু-এর বাচ্চাটাকে পড়াতে যায় ইন্দ্রাণী, পাশের পাড়াতে ওদের বাড়ি। বাচ্চাটির বাবা অর্থাৎ বিমলকাকুর ছোটো থেকেই চেনা-জানা ইন্দ্রাণীদের সঙ্গে। যেহেতু পড়াশোনায় ভালো, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের পর পাড়া থেকে সংবর্ধনাও পেয়েছে তাই ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জির এ অঞ্চলে ভালো মেয়ে হিসেবে পরিচিতি আছে। কিন্তু স্কুল কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে যত বড়ো হচ্ছে, চেনা পৃথিবীর মানুষগুলোই ক্রমশ যেন অচেনা হয়ে সামনে আসছে। তিন্নির বাবা বিমলকাকুকে ছোটো থেকে চেনে ইন্দ্রাণী, ইদানীং তিন্নিকে পড়ানোর সময় সামনের সোফায় এসে খবরের কাগজ পড়েন কাকু কিন্তু চোখটা ঘুরতে থাকে ইন্দ্রাণীর সারা শরীরে। কী প্রচণ্ড অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে সকালগুলো কাটছে অথচ কোনো উপায়ও তো নেই। প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করা বাবার তো রিটায়ারমেন্ট হয়ে গিয়েছে। দিদির বিয়ে আজ দু'বছর হলো। তাই বর্তমানে প্রতিদিনের রোজনামচায় এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিগুলোকে মানিয়ে নিতেই বাধ্য এখন ইন্দ্রাণী।

'ইন্দ্রাণী'— এটি শুধু একটি নাম নয়, শত শত মধ্যবিত্ত যুবতী মেয়ের প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী আপাদমস্তক শরীরকে ঢেকে রেখে লজ্জা সম্ভ্রমকে বাঁচিয়ে চললেও যাদেরকে প্রতিনিয়ত ধর্ষিতা হতে হয় হাজার হাজার চোখের চাউনিতে, সভ্য সমাজের স্পর্ধায় বাড়বাড়ন্ত পুরুষের কুইঙ্গিতপূর্ণ শব্দবাণে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ২৫ বছরের কোনো যুবককে কিন্তু এই লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয় না। শুধু মেয়েদেরই কেন? পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য বিস্তর। একটি মেয়ের জীবনযুদ্ধকে সেভাবে ধর্তব্যেই আনা হয় না। প্রতিমুহূর্তেই যেন এটাই বোঝানো হয় যে 'তুমি তো পরের ঘরের', আর দ্বিতীয় একটি মেয়ের 'মেয়ে' হওয়ার পার্থক্য। একটু বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতি পদক্ষেপে তাকে অনুভব করানো হয় যে সে 'নারী'। তার শরীরের নতুন ভাঁজে কুদৃষ্টি এসে পড়ে বিকৃত রুচির মানুষগুলির। পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলো হঠাৎই রোমিও হয়ে গান গাইতে গাইতে কুমন্তব্য করে বসে। ভিড়বাসে উঠলে বাসের কনডাক্টর থেকে শুরু করে কাকু, জেঠু এমনকী দাদুর বয়সি লোকগুলোও ভিড়ের সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে ব্যস্ত থাকে। কর্মক্ষেত্রেও চিত্রটির কোনো ব্যতিক্রম নেই।

এখনো পর্যন্ত যতগুলি দিক নিয়ে আলোচনা করলাম সবকটি একটি শব্দবন্ধনীর আওতায় পড়ে যায়, তা হলো 'ইভটিজিং'। মূলত প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথেঘাটে উত্ত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নির্যাতনের নির্দেশক শব্দ রূপে 'ইভটিজিং' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'ইভ' বলতে নারী এবং টিজিং শব্দটির অর্থ বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত করা। অর্থাৎ এটি এক ধরনের যৌন আগ্রাসন, যার মধ্যে রয়েছে যৌন ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য, প্রকাশ্যে অযাচিত স্পর্শ, শিস দেওয়া বা শরীরের সংবেদনশীল অংশে হস্তক্ষেপ। কখনো কখনো একে নিছক রসিকতা গণ্য করা হয় যা অপরাধীকে দায় এড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অনেক নারীবাদী সংগঠন আরও উপযুক্ত শব্দ দিয়ে ইভটিজিংকে প্রতিস্থাপনের দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে ইভ শব্দের ব্যবহার নারীর আবেদনময়তাকে নির্দেশ করে যে কারণে উত্ত্যক্ত হওয়ার দোষ নারীর ওপরে বর্তায় আর পুরুষের আচরণ আগ্রাসনের পরিবর্তে স্বাভাবিক ছাড় পায়। ইভটিজাররা নানান কৌশলে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে থাকে, ফলে এ অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন।

ইভটিজিংকে অন্য যে কোনো অপরাধের চেয়ে প্রায়ই এটিকে একটি নিরীহ অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। তবে এর বিরুদ্ধে আইনগত বেশ কিছু ধারা রয়েছে যা যথেষ্ট শাস্তিমূলক। ধারা ২৪৪ আইপিসি (ভারতীয় দণ্ডবিধি), ধারা ৩৫৪ আইপিসি, ধারা ৫০৯ আইপিসি, ধারা ৩৫৪এ, ৩৫৪বি আইপিসি, ধারা ৩৫৪সি ভয়ারিজম, ধারা ৩৫৪ডি প্রভৃতি। প্রতিক্ষেত্রেই কারাদণ্ড ও জরিমানা। ইভটিজিঙের প্রভাব মারাত্মক। অপরাধটি প্রথমে একটি মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা হিসেবে শুরু হয় এবং নিরীহ দেখায়। পরবর্তীকালে এটি অপহরণ, ধর্ষণ এবং হত্যার দিকেও নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং ছোট্ট ঘটনা বলে দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার মূর্খতা আজকের নারী যেন কখনোই না করে। প্রথমেই সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে তা সে যত ছোট্ট রোজনামচাতেই ধরা পড়ুক না কেন। ◻

স্লিপ ডিসঅর্ডার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক সাত থেকে আট ঘণ্টার গড় ঘুম দরকার। কিন্তু দিনের পর দিন যদি আপনার ঘুম না হয়, কিংবা রাতে ঘুম ভেঙে যায়, বা মাত্র তিন-চার ঘণ্টা ঘুমোন, কোয়ালিটি স্লিপ থেকে বঞ্চিত হন, খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে আপনার স্লিপ ডিজঅর্ডার আছে, অবিলম্বে বিশেষজ্ঞদের দেখাতে হবে। স্লিপ ডিজঅর্ডার বলতে অনেকগুলি ঘুম সংক্রান্ত সমস্যাকে বোঝায় যা নিয়মিত ভিত্তিতে ঠিকঠাক ঘুম হতে দীর্ঘদিন ধরে বাধা দেয়।

যখন একজন রোগী মাথাব্যথার সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যান, প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এর কারণ স্নায়ুগত সমস্যার সঙ্গে জড়িত এবং ওই ব্যক্তির যে কবে থেকে স্লিপ ডিজঅর্ডার হয়েছে তা সে নিজেও জানে না। তাকে ঘুমের প্যাটার্ন সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করে জানা যায় যে সে স্লিপ ডিজঅর্ডারের শিকার। ইনসোমনিয়া সবচেয়ে বেশি দেখা যায় স্লিপ ডিজঅর্ডারের রোগীদের ক্ষেত্রে, অন্যান্য যে ধরনের স্লিপ ডিজঅর্ডার দেখা যায়, সেগুলি হলো :

১। স্লিপ অ্যাপনিয়া : এই রোগে ঘুমের মধ্যেই শ্বাসকষ্ট হয়। শ্বাসগ্রহণ করতে রোগীর সমস্যা হয়। কখনও কখনও কয়েক সেকেন্ডের জন্য শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, আবার শুরু হয়। এর ফলে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় মস্তিষ্কেও কয়েক সেকেন্ড অক্সিজেন যায় না। ফলে রোগীর অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। শুধু মস্তিষ্ক কেন, শরীরের অন্যান্য অংশেও রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

স্লিপ অ্যাপনিয়ার সাধারণ উপসর্গগুলি হলো ঘুমের মধ্যে ভয়ংকরভাবে নাক ডাকা, রোগী মুখ দিয়ে জোরে ফুঁ দেওয়ার মতো আওয়াজ করে ঘুমের মধ্যে, ঘুম ভেঙে গেলে রোগীর মনে হয় মুখ, গলা শুকিয়ে আসছে প্রবলভাবে। কখন ঘুমের মধ্যে যে এগুলি হয় রোগীর কোনও সাড়ও থাকে না। এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসকের কাছে প্রায়ই ড্রাইমাইথের সমস্যা নিয়ে আসেন।

২। রেস্টলেস লেগস সিনড্রোম : রেস্টলেস লেগস সিনড্রোম আদতে একটি স্নায়ুগত সমস্যা, যাতে কোনো একজন ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে ক্রমাগত পা নাড়িয়ে যাওয়ার সমস্যায় ভোগে। মস্তিষ্কের মধ্যে বার্তা যেতে থাকে পা নাড়াতে হবে। এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে সে পা নাড়াতেই থাকে অনবরত। এই রোগের উপসর্গ হলো ঘুমের পরে পায়ে কোনো ধরনের ব্যথা, ক্র্যাম্প ধরা বা কখনও কখনও জ্বালা ধরার মতো অনুভূতি হতে থাকে। যেহেতু এটা ঘুমকে বিঘ্নিত করে তাই চিকিৎসকরা একে স্লিপ ডিজঅর্ডারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৩। স্লিপ প্যারালিসিস : শিরোনাম পড়ে ভাবছেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোনো অংশ অসাড় হয়ে গেল? নাহ্, ঘাবড়াবেন না। এতটাও গুরুগম্ভীর নয়। আসলে স্লিপ প্যারালিসিস হলো এমন একটি অদ্ভুত স্লিপ ডিজঅর্ডার, যাতে ঘুম থেকে ওঠা বা ঘুমোনোর সময়ে মানুষ কোনো কথা বা নাড়াচাড়া করতে পারে না। মুখ, গলা, শরীর সমস্তটাই যেন অসাড় হয়ে আসে। ভয়ংকর সমস্যা এবং একে কোনোভাবেই অবহেলা করলে চলবে না। এই রোগের উপসর্গও অদ্ভুত, রোগীর শরীরে মনে হয় ক্রমাগত কেউ চাপ দিচ্ছে এবং হঠাৎ হঠাৎ সে ভয় পেতে থাকে, চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সে সজাগ ও সচেতন থাকে, কিন্তু চলাফেরা করতে একেবারেই সক্ষম থাকে না।

৪। সাকডিয়ান রিদম ডিজঅর্ডার : এটা এমন এক ধরনের স্লিপ ডিজঅর্ডার যখন শরীরের অভ্যন্তরীণ বায়োলজিক্যাল ক্লকটি শরীরের বাইরে সময় ও তার কাজকর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানিয়ে চলতে পারছে না। এই ধরনের সমস্যা সাধারণত দু ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে চলতে থাকে। যেসব লোকজন রাতে দেরি করে শুতে যায়, অনেক রাত পর্যন্ত দিনের পর দিন জেগে থাকে, সকালে দেরি করে ওঠে কিংবা রাতে ঘুমানোর বা সকালে ওঠার কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকে না, শরীরে বডিক্লকের স্বাভাবিক ছন্দই বিঘ্নিত হয়, তখনই এই ডির্জঅর্ডারটি বেশি বেশি করে দেখা যায়। নাইটশিফটে কাজ করা লোকজন বা যারা ঘন ঘন জেটল্যাগের শিকার তাদের এই সমস্যা বেশি হয়।

৫। ইনসোমিয়া : ইনসোমিয়া খুব কমন এক ধরনের স্লিপ ডিজঅর্ডার, যেখানে মানুষের ঘুম আসতে সমস্যা হয়। এদের দিনের বেলা ঘুমানোর প্রবণতা থাকে। এদের এনার্জি লেভেল কম থাকে ও মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসু। ▯

ক্যানসারের প্রধান কারণ কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

এই যে করোনা বাতাবরণ অর্থাৎ কমিউনেকেবল (ছোঁয়াচে) এক রোগ নিয়ে সারা বিশ্ব হিমসিম খাচ্ছে তার মধ্যেই কিন্তু মনে করতে হচ্ছে আরও এক নন কমিউনিকেবল (যা ছোঁয়াচে না) রোগের কথা। হ্যাঁ ঠিকই— ক্যানসার। খুব সহজ ভাবে যদি বুঝতে চাই ক্যানসার কী— তাহলে তার সাদামাটা উত্তর হবে 'অতি বড়ো বাড়া'। দেহজ কোষ যখন জীব-রাসায়নিক সব সংকেত (সেল সিগন্যাল) অমান্য করে তখন তা এই মারণ রোগের আমন্ত্রণ করে। কী অদ্ভুত আর মজার বিষয় 'বিভাজন' শব্দে। আমরা তো বিভাজন বলতে বুঝি কমে যাওয়া। কিন্তু কোষ বিভাজন কথাটা যখনই আসবে বুঝতে হবে কোষ তৈরি হচ্ছে। দেহের কোটি কোটি কোষ থেকে আবার নতুনের সৃষ্টি এবং নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় আদেশেই তা হওয়া উচিত। যেই না আদেশের তোয়াক্কা না করা তখনই অনিয়ন্ত্রিত জীব কোষের সৃষ্টি এবং যা রক্ত থেকে ফুসফুস বা যে কোনো অঙ্গকে শেষমেশ আক্রমণ করে। তবে শরীরের যে অঙ্গটি প্রথম এই অনিয়ন্ত্রিত কোষের বাড়বাড়ন্ত শুরু করে সেই অঙ্গের ঘাড়েই দায় চাপে। এবং সেই মোতাবেক নামকরণ। যেমন ব্রেস্ট ক্যানসার, লাঙ্গস ক্যানসার ইত্যাদি। কিন্তু পরিশেষে এই মারণ দুষ্টু কোষের দল পড়ে সারা দেহেই তার উপস্থিতি জানান দেয়। তবে এই যে কোষের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বললাম তার ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই টিউমার তৈরি হয়। একটু আশার কথা এই যে টিউমার হলেই তা মারণ নাও হতে পারে। যেগুলি বিনাইন (অক্ষতিকারক) তারা ততটা ভয়ংকর নয়। কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হচ্ছে সেই অনিয়ন্ত্রিত কোষ যা সারাদেহে এবং দেহজ তরলে, তা সে রক্ত হোক বা লসিকায় ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হয়। এই যে একটা অঙ্গে তৈরি হওয়া টিউমার থেকে ক্যানসার কোষ সারা দেহে বিস্তার লাভ করছে এর থেকে এই ধারণা নিশ্চয়ই হচ্ছে যে এই আক্রণাত্বক কোষগুলো তাদের চরিত্রও বদলে ফেলেছে। একে বলে মেটাস্টাসিস।

এই রোগটির সঙ্গে জিনের গভীর যোগ সম্বন্ধ। প্রথমটি হলো প্রোটো অনকো জিন—

যারা সাধারণ পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন ঘটানোর নিয়ন্ত্রক কিন্তু যেই এই জিনটি তার চরিত্র বদলে ফেলে তখনই ঘটে বিপদের শুরু। তখন ওকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় অনকো জিন। দ্বিতীয় শিরোমণি হলো চরিত্র বদলে বিগড়ে যাওয়া টিউমার সাপ্রেসার জিন। এটি বদল হলেই টিউমারকে বাড়তে উৎসাহ দেয়। এবং তৃতীয় কালপ্রিট হলো ডিএনএ রিপেয়ার জিনের ভোল বদল। জিনের আকস্মিক বদল যাকে মিউটেশন বলে তাই ক্যানসার ঘটানোর মূল পাণ্ডা। এই যে জিনের আকস্মিক পরিবর্তন যাকে মিউটেশন বলে তা কিন্তু রাতারাতি দুম করে হয়ে গেল তেমনটাও ঠিক না। আমাদের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি নানান কারণের সম্মুখীন যখন হচ্ছি এবং সেই ঋণাত্মক পারিপার্শ্বিকের প্রভাব যখন জিনের পরিবর্তন ঘটায় তখনই তা ক্যানসার তৈরির অনুকূল পরিবেশ দেয়।

ক্যানসার নিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতিতে যে মতান্তর আছে তা কে না জানি। করোনার জন্য যেহেতু একটা ভ্যাকসিন আবহে আমরা আছি তাই ক্যানসার ভ্যাকসিন নিয়ে দু'চার কথা বলি। ২০১০-এ প্রথম পরীক্ষামূলক প্রয়োগ। রোগীর নিজেরই ডেনড্রাইটিক কোষ ব্যবহৃত হয়। তারপর বড়ো সাফল্য আনে ২০১৪ সালে। গারডাসিল ৯ ভ্যাকসিন (এফডিএ অনুমোদিত) ৯৫ শতাংশ সাফল্য দেখায় সারভাইকাল ক্যানসারের ক্ষেত্রে। কেমোথেরাপি থেকে মলিকিউলার থেরাপি বা CART T cell থেরাপি সবই অবিরাম গতিতে ধারাবাহিক ভাবে গবেষণাধীন। এই করোনা আবহেও কিন্তু ক্যানসার সংক্রান্ত গভীর চর্চা যারা করেছিলেন তারা ছুটি নেননি। এই ধাঁধার উৎপত্তি বিস্তার এবং সম্পূর্ণ নিরাময় নিয়ে কেউ সমান তালে কথা আজও বলতে পারছেন না। কোনও আন্তর্জাতিক মানের আলোচনা সভায় কখনও কখনও এমন ভুল না হয়— বিজ্ঞান সেমিনার নাকি রাজনৈতিক তর্ক! এতো কিছুর পরেও একটা বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ল। আমেরিকাতে ভীষণ জনপ্রিয় হয়। 'there is a' CAN 'in cancer because we can beat it' অবশ্যই। এ নিয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারে না, ক্যানসার একটা শব্দ। সম্পূর্ণ বাক্য না। বিভ্রাট আছে বলেই গবেষণাগারে আলো বন্ধ হয় না। ১৯২৬-এ স্টমাক ক্যানসারের গবেষণার জন্য যে বিজ্ঞানী নোবেল পেয়েছিলেন, পরে দেখা গেল ওটা ভুল আবিষ্কার! ভুল কে ভুল প্রমাণ করা গিয়েছিল এটাই বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার পরিতৃপ্তি। তবে এই নিবন্ধ যেদিন প্রাসঙ্গিকতা হারাবে হয়তো সেদিন আমরা জয়ী হবো। ■

পরিবারে ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে সতর্ক থাকতে হবে

ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়

আমার কথা শুরু করছি একটি সাধারণ প্রশ্ন দিয়েই। আমার কাছে অনেকেই জানতে চান যে এই ক্যানসার রোগটির উপসর্গগুলি কী কী? এই প্রশ্নের উত্তরে একটি কথা বলতে হয় যে বহু ক্ষেত্রেই এই রোগটির কোনো উপসর্গ বোঝা বা দেখা যায় না। এটাকে আমরা অন্যভাবেও বলে থাকি যে, এটি একটি সাইলেন্ট ডিজিজ। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে কয়েকটি বিষয়ে আমরা সচেতন থাকার কথা বলে থাকি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, অন্যান্য সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে যে ধরনের উপসর্গ দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে সেই ধরনের উপসর্গ ক্যানসারের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কয়েকটি উপসর্গের উদাহরণ দিই, যেমন মুখে একটি সাধারণ ঘা, যেটি দীর্ঘদিন ধরে সারছে না বা কোনো ব্যথাহীন মাংসপিণ্ড, সেটা ব্রেস্টে বা স্তনে হতে পারে বা অন্য জায়গায় হতে পারে। একটু বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে, যাদের গিলতে অসুবিধা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে তাঁর খাদ্যনালীতে ক্যানসার হয়েছে। আবার দেখা গেছে গলার স্বর পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ আচমকা কথাটা বসে গেল, কথাটা ঠিকমতো বেরোচ্ছে না— এখন এইসব উপসর্গ যদি দু' সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়, তাহলে চিন্তার কিছু নেই, যদি না সারে, সমস্যাটি বাড়ছে বলে মনে হয়, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে জানার চেষ্টা করা উচিত যে এটির মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কি না।

এছাড়াও আরও কয়েকটি উদাহরণে যেতে পারি, যেমন পেটের ক্যানসারের ক্ষেত্রে, গল ব্লাডারে ক্যানসার, স্টম্যাকে ক্যানসারের কথা যদি বলা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এসবের ক্ষেত্রে কোনো উপসর্গ খুব একটা দেখা যায় না। অনেকেই পেটে সামান্য গণ্ডগোল হলে, বা ব্যথা অনুভূত হলে, সেটা কমানোর জন্য নিজের মতো করে ওষুধ খেয়ে নিলেন, সাময়িক ভাবে হয়তো ঠিক হয়ে গেলেন। আবার দেখা দিল। অস্বস্তি বারে বারে দেখা দিতে থাকে। সেক্ষেত্রে বলব, অপেক্ষা না করে চিকিৎসকের সাহায্য নিন। জানার চেষ্টা করুন, আসল কারণটি কী? তিনিই আপনাকে একেবারে সঠিক কারণটি নির্দিষ্ট করে বলে দেবেন। বিষয়টি আপনার কাছে সাধারণ মনে হলেও, বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেটি সাধারণ নাও হতে পারে। পরীক্ষায় অনেক ক্ষেত্রেই গলব্লাডার, লিভার, স্টম্যাক বা প্যাংক্রিয়াস সম্বন্ধে আমাদের মনের স্বাভাবিকতার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিচ্ছি, জন্ডিস হয়েছে, সারছে না। পরীক্ষার পর দেখা গেছে সেটি ক্যানসার। মনে রাখতে হবে যে আমাদের শরীরের ভিতরে থাকা অঙ্গগুলি যদি কোনোভাবে অস্বাভাবিক আচরণ করে, চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ কেন করছে, সেটির কারণ নিশ্চিত হওয়াটা জরুরি।

এবারে আসি অন্য একটি প্রসঙ্গে। অনেক সময়ে আমরা দেখি যে আমাদের নাক বা মুখ দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। বা মলদ্বার দিয়ে হতে পারে, মূত্রের সঙ্গেও রক্ত আসতে পারে, এই সব ক্ষেত্রে পরীক্ষা করলে কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ক্যানসার চিহ্নিত হয়েছে। তবে বলব সব ক্ষেত্রে নয়। আবার বলছি, নিজেরা কিছু ভেবে নেবেন না,

শারীরিক অস্বাভাবিকতা দেখলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কেউ কেউ আমরা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগি, আবার একটু লুজ মোশনেও আক্রান্ত হই। আবার ডায়েরিয়াতে ভুগি বা পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে, এই ক্ষেত্রে অনেকেই সেটা পাইলস হিসেবে ধরে নেন। এবং সেই হিসেবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। অথচ বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা অস্বাভাবিক কিছুর গ্রোথ হয়েছে, যেটা পরবর্তীকালে ক্যানসার হিসেবে চিহ্নিত হয়।

সাধারণ মানুষকে একটি কথা বলার প্রয়োজন মনে করি, সামান্য একটা চেস্ট এক্সরে, তাতে লাঙের ক্যানসার ধরা পড়ে। কীভাবে সেটা বলি। কাশি হয় বা কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে, তখন চিকিৎসক বেশির ভাগ সময় এই এক্সরে করতে বলেন, আর তাতেই কিন্তু ধরা পড়তে পারে লাং ক্যান্সার। আবার আলট্রা সোনোগ্রফিতেও পেটের অনেক ক্যানসার ধরা পড়ে। এমনকী রক্ত পরীক্ষাতেও কিছু কিছু ক্যানসার ধরা পড়ে। চিকিৎসক যে পরামর্শ দেবেন সেটাকেই অসুসরণ করে চলা উচিত। তিনি যদি বলেন কোলোন্সকপি করতে, তাহলে তাই করবেন বা এন্ডোস্কপি করতে বললে তা অবশ্যই করতে হবে।

এবার আসি আরেকটি প্রসঙ্গে। আমাদের খাদ্যের সঙ্গে কিন্তু ক্যানসারের একটু হলেও সম্পর্ক আছে। যারা অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাবার খান বা অতিরিক্ত ফ্যাট খান, তাঁদের কিন্তু ক্যানসার হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সাধারণ ভাবে আমরা হয়তো জানি, তামাক এবং অ্যালকোহল; কিন্তু ক্যানসারের কারণ। যারা এগুলি সেবন করেন, তাঁদের মুখের ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেক বেশি। অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় কিন্তু দশগুণ বেশি কারণ হিসেবে এটি লক্ষিত হয়। আমরা যা ক্যানসার দেখি, তার মধ্যে ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ ক্যানসারের কিন্তু অ্যালকোহল ও তামাকের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং এগুলি থেকে দূরে থাকবেন। যারা অতিরিক্ত স্মোক ফুড খান, তাদের খাদ্যনালীর ক্যানসার হবার সম্ভাবনা থাকে। আবার ফিরে আসি আগের কথায়, যারা চর্বি জাতীয় একটু বেশি খান, একটু মোটা হয়ে যান। মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি ব্রেস্ট ক্যানসার, ইউটেরাস ক্যানসার, ওভারি ক্যানসার সমেত বেশ কিছু ক্যান্সারের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রেও প্রস্টেট ক্যানসার, লাং ক্যানসার, কোলন ক্যানসার সমেত বেশ কিছু ক্যানসারের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। ফলে এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদের সচেতন থাকতে হবে। এছাড়া যারা নিয়মিত রেডমিট খান, একটু নিয়ন্ত্রণ রাখবেন। মাঝে মাঝে খান। অসুবিধা হবে না। কিন্তু নিয়মিত খেলে কোলন ক্যানসারের বা রেক্টাম ক্যানসারের সম্ভাবনা দেখা দিলেও দিতে পারে। এটা কিন্তু আমাদের দেশের নর্থ-ইস্টে বেশ দেখা গেছে।

তবে মনে রাখবেন,ক্যানসার নিয়ে ভয় পাবার কারণ নেই। এটি কিন্তু সবার হয় না। তবে যাদের পারিবারিক এই রোগের ইতিহাস আছে, তারা কিন্তু একটু বেশি সচেতন ও সতর্ক হয়ে নিজেকে রক্ষা করে চলবেন। মনে রাখবেন, এটা কিন্তু জিন ঘটিত। সেক্ষেত্রে বলব নিয়মিত ভাবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, যে কোনো অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে পরামর্শ নেবেন। আর একটি বিষয় বলি, সরকারি হাসপাতালে নিখরচায় নানা পরীক্ষায় প্রাথমিক স্তরেই ধরা পড়ে ক্যানসার। সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, একেবারে গোড়াতেই যদি ধরা পড়ে, তাহলে উপযুক্ত চিকিৎসায় সেরে যায় ক্যানসার।

একজন ক্যানসার রোগীর যদি কোভিড হয়, তাহলে একটা মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে— এই ধারণা ভুল। সাধারণ মানুষের যেমন কোভিড হলে নানা উপসর্গ হবে, সেই মতো চিকিৎসা হবে, আবার তিনি রোগমুক্তও হবেন তেমনি একজন ক্যানসার রোগীও কোভিড আক্রান্ত হলে চিকিৎসায় রোগমুক্ত হতে পারেন। ফলে অহেতুক ভয় পাবার কারণ নেই। মনে রাখবেন, যাদেরই কোমর্বিডিটি রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রেই কোভিড মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে। এর থেকে রেহাই পাবার উপায়, করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। মাস্ক, স্যানিটাইজার, সামাজিক শারীরিক দূরত্ব বিধি মেনে চলা। এটাই প্রাথমিক কর্তব্য। আবার ফিরে আসি অতি প্রয়োজনীয় কথায়। একজন ক্যানসার রোগীর জন্য করোনা ভ্যাকসিন নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। আর অবশ্যই দুটো ডোজ নিতেই হবে।

(লেখক একজন বিশিষ্ট অনকোলজিস্ট)

(অনুলিখন : স্বপন দাস)

ক্যানসারের উপসর্গ

ফুসফুস

১. অনেকদিন ধরে কাশি। ২. কাশির সঙ্গে রক্ত। ৩. বুকে যন্ত্রণা এবং শ্বাসকষ্ট। ৪. হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া। ৫. ক্লান্তিবোধ এবং দুর্বলতা। ৬. মাঝে মাঝে ব্রঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া।

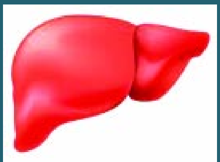

লিভার

১. হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া। ২. খিদে না থাকা। ৩. পেটে যন্ত্রণা। ৪. বমিভাব। ৫. ক্লান্তিবোধ এবং দুর্বলতা। ৬. ত্বকে হলুদভাব এবং চোখ সাদা হয়ে যাওয়া।

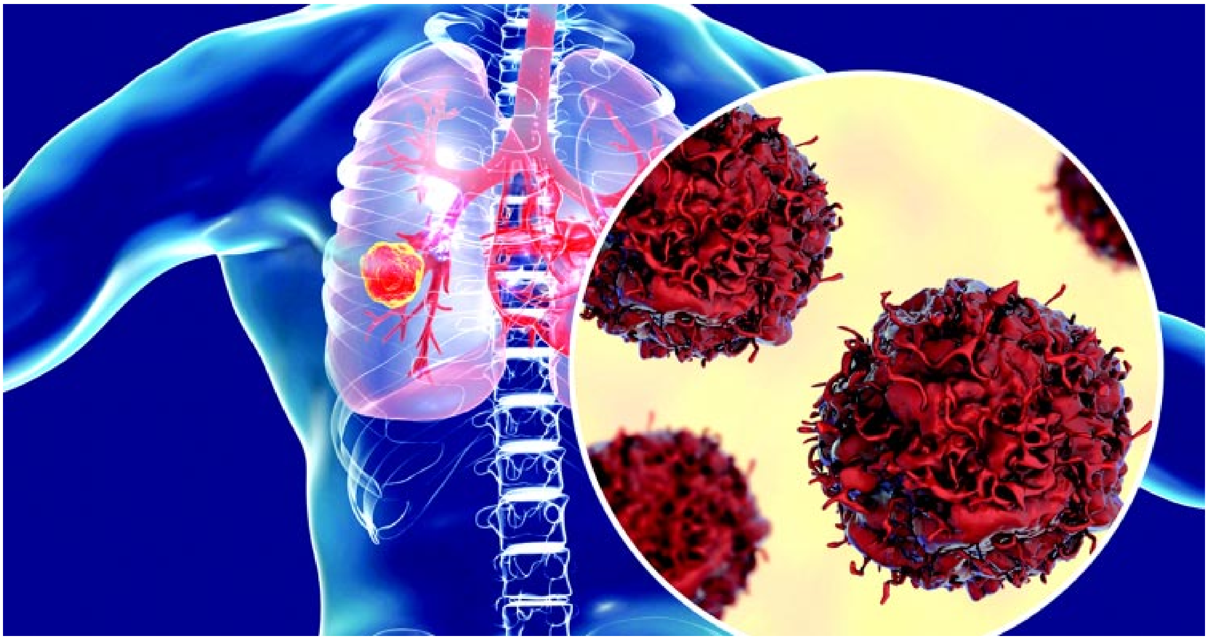

ফুসফুসের ক্যানসার কী এবং এ থেকে বাঁচার উপায়

ডাঃ উচ্ছল কুমার ভদ্র

ক্যানসার হচ্ছে দেহকোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন ও সংখ্যা বৃদ্ধি। দেহকোষের বিভাজন ও সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম এবং এর ফলেই শরীরের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ হতে থাকে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের দেহের ত্বকের কোষগুলো ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খসে পড়ছে আর নীচের স্তরটি ওপরে উঠে আসছে; ফলে আমাদের সারা দেহের চামড়াটা প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর পুরোপুরি পালটে যাচ্ছে। একটা শার্ট ছেড়ে আর একটা শার্ট পরার মতো, আপনি অন্তত বাইরের দিক থেকে হলেও, প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর এক নতুন মানুষ হয়ে যাচ্ছেন। চামড়ার কোষের বিভাজন ও সংখ্যাবৃদ্ধি না হলে কিন্তু এটা সম্ভব হতো না। এই বিভাজন ও সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজনের ভিত্তিতে শরীর বিভিন্ন সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে। যখনই কোনও কোষ কোনও কারণে ওই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখনই ঘটে বিপত্তি; সে নিজ নিয়মে বিভাজিত হতে থাকে, এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন প্রতিটি কোষই ওই অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন ক্ষমতার অধিকারী হয়। বিভাজন হতে হতে কোষের পাহাড় তৈরি হয়ে সেখানটা ফুলে ওঠে (তাকে 'টিউমার' বলা হয়, যদিও সব টিউমারই ক্যানসার নয়), শুধু তাই নয়, কোষের ওই গুচ্ছ থেকে বাড়তি কোষ বিচ্যুত হয়ে রক্ত বা লসিকাবাহী নালিকা দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ওই একই ঘটনা ঘটাতে থাকে (একে বলে 'পরিব্যাপ্তি' বা 'মেটাস্টেসিস')।

দেহের বেশিরভাগ ক্যানসারই হয় নিম্নোক্ত চারটে কারণে :

- ধূমপান ও তামাক সেবন।
- অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও অপর্যাপ্ত শারীরিক শ্রম।
- সূর্যালোক ও অন্যান্য বিকিরণের প্রভাব।
- ভাইরাস ও অন্যান্য সংক্রমণ।

ভারতে পুরুষ ও মহিলাদের প্রথম পাঁচটি ক্যানসার সারণীতে দেওয়া হলো। এর মধ্যে প্রথম দু'টির পরিমাণ সমস্ত রকমের ক্যানসারের ২৫ শতাংশ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ। ওপরের চারটি কারণ এবং সারণীর তথ্যগুলো মেলালে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পুরুষদের ক্ষেত্রে ধূমপান ও তামাক এই দুটি ব্যাপারই তাদের এক চতুর্থাংশ ক্যানসারের জন্য দায়ী। আর একটা বিষয়ও উল্লেখ করা দরকার, সারণীর প্রতিটি ক্যানসারই নিবারণযোগ্য এবং একবার রোগ হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি তা ধরে ফেলে চিকিৎসা করা যায়, ততই বেশিদিন রুগিকে বাঁচানো যায়।

কোনও সন্দেহ নেই, ফুসফুসের ৯০ শতাংশ ক্যানসারই (যাকে আজকাল সাধারণ ভাষায় বলা হয় 'লাং ক্যানসার') হয় বহুদিন ধরে বিড়ি-সিগারেট খাবার ফলে। বিড়ি ও সিগারেটের ধোঁয়ায় কমপক্ষে ৭ হাজার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে, এদের মধ্যে ৬০টিরও বেশি থাকে ক্যানসার হয় এমন প্রমাণ মিলেছে। আর থাকে 'নিকোটিন' নামের এক রাসায়নিক পদার্থ, যা তামাকের প্রতি এক অদ্ভুত নাছোড়বান্দা আসক্তি উৎপাদন করে।

একজন ৫৫ বছর বয়সি মানুষের কথা ধরা যাক, যিনি২০ বছর ধরে প্রতিদিন ২০ সিগারেটের ১টি করে প্যাকেট খেয়েছেন। ধরে নিই তাঁর নাম প্রফুল্লবাবু। প্রফুল্লবাবু সারাজীবনে ২৯২,০০০টি সিগারেট পুড়িয়ে তার ধোঁয়া ফুসফুসে ঢুকিয়েছেন। শরীর সেই ভয়ংকর অভিঘাত সামলানোর

প্রচেষ্টা প্রতিটি মুহূর্তে করে গেছে, তিনিও থামতে চেয়েছেন বটে, একদিনের জন্যও থামতে পারেননি। প্রফুল্লবাবু জানেন না, তামাকের 'নিকোটিন' ফুসফুসে ঢোকার ৮ সেকেন্ডের মধ্যে মস্তিষ্কে পৌঁছে গিয়ে এক আনন্দের আমেজ আনে, ফলে শরীরে ও মনে এই আসক্তি উৎপন্ন হয়। তার এই দীর্ঘ দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের ফল কিছুই হবে না, সব কিছুই স্বাভাবিক থাকবে, এমন তো হতে পারে না। কর্মঠ, সফল, শক্ত চেহারার বন্ধুবৎসল প্রফুল্লবাবু কাশতেন, যেমন সব ধূমপায়ীরাই মাঝে মাঝে একটু আধটু কাশেন। সবাই তাঁকে সিগারেট ছেড়ে দিতে বার বার বলেছে, এমনকী তাঁর ডাক্তারও বলেছেন যে, কথা না শুনলে তাঁর কাছে আসার দরকার নেই। প্রফুল্লবাবু নিরুপায় ভাবে বলতেন, 'চেষ্টা করেও তো পারছি না, ডাক্তারবাবু।' একদিন সকালে তাঁর স্ত্রী ফোন করেন ডাক্তারকে, 'ওঁর নাক দিয়ে একটু রক্ত পড়ছে, শেভ করতে গিয়ে দেখলেন।' ডাক্তারবাবু গিয়ে দেখেন ভদ্রলোক স্বাভাবিক, প্রাতরাশ করছেন। স্ত্রী একটু চোখের আড়াল হতেই বললেন, 'ডাক্তারবাবু, নাক দিয়ে নয়, কাশতে গিয়ে একটু রক্ত এলো। ফোন করে বিকেলে আপনার কাছে নিজেই যেতাম...।' পরবর্তী মাসগুলোর ইতিবৃত্ত কষ্ট ও প্রায়শ্চিত্তের। উল্লেখ্য এই যে, যেদিন তাঁর বায়োপসি হলো, রিপোর্ট আসার আগেই তিনি ধূমপান একেবারে বন্ধ করে দিলেন। এতদিন যা 'শত চেষ্টা করেও' পারেননি, এখন কী করে পারলেন? ডাক্তার তাঁকে অনেকবার বলেছেন, 'ধূমপান আসলে আপনার এক মর্মান্তিক বিলাসিতা।' হঠাৎ করে তিনি ধূমপান বন্ধ করে দিয়ে তারই প্রমাণ দিলেন।

২০ বছর ধরে ২৯২,০০০ খানা সিগারেটের ধোঁয়া ফুসফুসে ঢুকে ঠিক কী কাজ করেছে? নাক থেকে শুরু হয়ে মানুষের শ্বাসনালী গলা দিয়ে নেমে ভাগ হতে হতে শেষ পর্যন্ত চুলের মতো সরু নালিকায় পর্যবসিত হয়, যার নাম 'ব্রঙ্কিওল'— এই ব্রঙ্কিওল থেকে বের হয় ফুসফুসের প্রসিদ্ধ 'বায়ুস্থলী' বা 'এলভিওলাস'গুলো। নিঃশ্বাস- প্রশ্বাসের বাতাস এই বায়ুস্থলী অবধি চলাচল করে। মানুষের ফুসফুসে ৪৮ কোটি বায়ুস্থলী থাকে। বায়ুস্থলীর অতীব পাতলা নরম স্বচ্ছ দেয়ালের বাইরের গায়েই থাকে অত্যন্ত সরু সরু রক্তনালী। নিঃশ্বাসের অক্সিজেন বায়ুস্থলীর দেয়াল ভেদ করে ওইসব রক্তনালীর দেয়াল ভেদ করে রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনে ঢুকে পড়ে; এতে রক্তের রং টুকটুকে লাল হয়ে যায়, অক্সিজেন সারা শরীরে বাহিত হয়ে কোষে কোষে পৌঁছে দেহকোষের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। একই সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড, যা সারা শরীরের প্রতিটি কোণের কোষে কোষে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়, তা প্রান্তিক রক্তনালীতে ঢুকে পড়ে রক্তের রং নীলচে লাল করে দেয়, আর শেষপর্যন্ত ফুসফুসের বায়ুস্থলীর পাতলা দেয়ালের বাইরের গায়ে থাকা অতীব সরু সরু রক্তনালীগুলোতে পৌঁছে যায়, তারপর

সারণী

	পুরুষ		নারী	
১.	ঠোঁট, মুখের ভেতর	২৫%	স্তন	২৫%
২.	ফুসফুস		ঠোঁট, মুখের ভেতর	
৩.	পাকস্থলী		জরায়ুমুখ	
৪.	মলাশয় ও পায়ু		ফুসফুস	
৫.	খাদ্যনালী		পাকস্থলী	

তাদের দেয়াল ভেদ করে, বায়ুস্থলীর দেয়াল ভেদ করে বায়ুস্থলীর বাতাসে ঢুকে প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। প্রফুল্লবাবু ২০ বছর ধরে সিগারেটের ধোঁয়ার প্রতিটি নিঃশ্বাসে ফুসফুসের ৪৮ কোটি বায়ুস্থলীতে ক্যানসার উৎপাদনকারী ৬০টিরও বেশি রাসায়নিক অণু সংবলিত ৭ হাজার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ঢুকিয়েছেন। ওই বিষগুলো প্রতিটি বায়ুস্থলীর তুলতুলে নরম পাতলা স্বচ্ছ দেয়ালের ওপর প্রতি মুহূর্তে আছড়ে পড়ে তাদের ক্ষতবিক্ষত করেছে, আর তারপর রক্তে মিশে সারা দেহের প্রতিটি কোষে ছড়িয়ে পড়তে থেকেছে। এর ফল কী হতে পারে?

বলাই বাহুল্য, ধূমপান সারা শরীরেই ক্যানসার-সহ বিভিন্ন অসুখের সৃষ্টি করে, কিন্তু এই বর্তমান পরিসরে আমরা ফুসফুসেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। প্রফুল্লবাবুর ফুসফুসে প্রথমে যেটা ঘটল, সেটা হচ্ছে গলা থেকে বায়ুস্থলীর দেয়াল অবধি শ্বাসনালীর ভেতরকার পাতলা তুলতুলে নরম আস্তরণে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বরযন্ত্রেও একটা প্রদাহ সৃষ্ট হয়ে ওগুলো একটু পুরু আর অনমনীয় হয়ে গেল, ফলে কাশি শুরু হলো, স্বর আস্তে আস্তে ক্রমশ ফ্যাশফেসে হতে লাগল এবং বায়ুস্থলীর অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসীয় আদান প্রদান ক্রমশ কমতে থাকল। শ্বাসনালী শক্ত হয়ে গিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসারণ-সংকোচন ক্ষমতা হ্রাস পেল। ফলে পরিশ্রমের কাজ, যাতে বেশি অক্সিজেন লাগে, তা করতে একটু একটু করে কষ্ট হতে শুরু হলো। কিন্তু এসব তো গেল সোজাসাপটা প্রাথমিক ব্যাপার। যে জৈব রাসায়নিক ঘটনাগুলো ফুসফুসে ঘটল সেগুলো আরও সাংঘাতিক। জিনগত অবক্ষয়ের ফলে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকারক মুক্তমৌলের উদ্ভব হলো এবং 'প্রোটিয়েজ' নামক এক উৎসেচকের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে আশেপাশের প্রোটিন অণুগুলোকে ভেঙে দিতে লাগল, এতে বায়ুস্থলীর দেয়ালগুলো ভেঙে গিয়ে বড়ো বড়ো প্রকোষ্ঠ তৈরি হলো, আর তাদের প্রধান কাজ গ্যাসীয় আদান প্রদান বিপুল ভাবে ব্যাহত হলো। এবং তখনই শুরু হলো আসল শ্বাসকষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে

ক্যানসারের উপসর্গ

ওভারিয়ান ক্যানসার

১. পেট ফাঁপা। ২. অল্প খাওয়ার পরেই পেট ভরে যাওয়া। ৩. হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া। ৪. নিতম্বে অস্বস্তি। ৫. ক্লান্তি। ৬. পিঠে যন্ত্রণা। ৭. কোষ্ঠকাঠিন্য। ৮. ঘন ঘন প্রস্রাব।

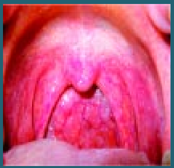

গলা

১. কাশি। ২. কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন, কথা বলতে না পারা। ৩. খাবার গলাধঃকরণে সমস্যা। ৪. কানে যন্ত্রণা। ৫. গলায় ক্ষত। ৬. হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া।

ফঃ ৪

হৃদযন্ত্রের অপক্রিয়া। তাছাড়া ক্ষতিকারক মুক্তমৌলগুলো সিগারেটের ধোঁয়ার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফুসফুসের প্রতিটি কোষকে প্রতি মুহূর্তে আঘাতে জর্জরিত করল, ফলে কোষগুলো আর স্ব-চরিত্র ধরে রাখতে পারল না— তাঁর জীবনের শেষের শুরু হয়ে গেল। কোষ বিভাজিত হতে হতে কোষের স্তূপ তৈরি হতে লাগল, তাদের অতিরিক্ত জায়গার দরকার, তাই তারা আশেপাশে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করল। সেই চাপ শ্বাসনালীতে পড়ে শ্বাসকষ্ট বাড়ল, খাদ্যনালীতে পড়ে খাবার গিলতে কষ্ট হতে লাগল। দেহের ওজন কমতে লাগল, ক্যানসার কোষের ওই স্তূপের তো খাবার চাই, যে খাবার রক্তনালী দিয়ে বাহিত হয়ে আসার কথা, কিন্তু এমন একটা সময় এল যে, ওই ক্রমবর্ধমান স্তূপের ভেতরে কেন্দ্রস্থলে রক্তনালী আর পৌঁছতে পারল না, ফলে ভেতরকার কোষগুলো মরে গিয়ে পচে সংক্রামিত হয়ে গিয়ে প্রফুল্লবাবুর কাশী অনেক বেড়ে গিয়ে হলুদ কফ বের হতে লাগল, জ্বর হলো, ওষুধে সেরেও সারে না। ক্যানসার কোষের 'পরিব্যাপ্তি' বা 'মেটাস্টেসিস'- এর ফলে গলার দু'পাশে গ্ল্যান্ড ফুলতে লাগল। রক্তনালীর দেয়ালের কোষগুলো ভেঙে গিয়ে রক্ত বাইরে বেরিয়ে এলো, কেশে কেশে রক্ত তুলতে লাগলেন প্রফুল্লবাবু।

ফুসফুসের ক্যানসারের ৯০ শতাংশ হয় ধূমপানের ফলে। যাঁরা ধূমপান করেন না, অর্থাৎ বাকি ১০ শতাংশ এর এই রোগ হবার কারণ : বাড়িতে বা কর্মস্থলে ধূমপায়ীদের সংসর্গে থাকা (এদের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা স্বাভাবিকের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি), পরিবেশ দূষণ (এসবেস্টস, ইউরেনিয়াম, নিকেল, ডিজেলের ধোঁয়া, রেডন গ্যাস ইত্যাদি), বায়ুদূষণ, এছাড়া বংশে মা-বাবা, ভাই-বোন এদের থাকলে হবার সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

ফুসফুসের ক্যানসার থেকে বাঁচার মৌলিক উপায় হচ্ছে ধূমপান আদৌ না করা, অথবা যথাসম্ভব শীঘ্র ছেড়ে দেওয়া। ধূমপান ছাড়তে চেয়েও ছাড়তে পারেননি প্রফুল্লবাবু। আমরা সমীক্ষায় দেখেছি যে, ধূমপায়ীদের ৭০ শতাংশ ধূমপান ছাড়তেই চান। আবার অনেকেই ভাবেন, ধূমপান ছাড়তে ভারি কষ্টই যে শুধু হয় তাই নয়, ছাড়ার পর উপকার পেতে বহুদিন লেগে যায়, কিন্তু তা সত্যি নয়। গবেষণা করে দেখা গেছে যে ধূমপান ছাড়ার পর তার ফল হাতেনাতেই পাওয়া যায় :

- **২০ মিনিট পর :** রক্তচাপ ও নাড়ির গতি স্বাভাবিক হয়ে যায়; হাত-পায়ের রক্ত সঞ্চালনের উন্নতি হয়।
- **৮ ঘণ্টা পর :** রক্তের অক্সিজেনের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে যায়, হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা কমতে শুরু করে।
- **২৪ ঘণ্টা পর :** বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিতাড়িত হয়; ফুসফুস শুরু করে দেয় শ্লেষ্মা ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করার কাজ।
- **৪৮ ঘণ্টা পর :** শরীরে নিকোটিনের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে।
- **৭২ ঘণ্টা পর :** শ্বাসনালীর প্রদাহ শিথিল হতেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়ে আসে।
- **২ সপ্তাহ পর :** রক্ত সঞ্চালনের আরও উন্নতি হওয়ার ফলে হাঁটা-চলা ও পরিশ্রম সহজতর হয়ে আসে।
- **৩ থেকে ৯ মাস পর :** কাশি, শ্বাসের শব্দ, শ্বাসকষ্ট সমস্ত কিছুরই নাটকীয় উন্নতি ঘটে।
- **৫ বছর পর :** হৃদরোগের সম্ভাবনা ধূমপায়ীদের থেকে অর্ধেক হয়ে যায়।
- **১০ বছর পর :** ফুসফুসের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা ধূমপায়ীদের প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।

ধূমপান ছাড়া যায় কীভাবে?

মার্ক টোয়েন বলেছেন, 'ব্যাপারটা অতি সহজ। আমি শত শত বার সিগারেট খাওয়া ছেড়েছি।' এই কথায় ধূমপানে আসক্তির মর্মান্তিক কৌতুক হৃদয় স্পর্শ করে। এই আসক্তি বড়ো ভয়ানক; এর দুটো দিক আছে— ধূমপানের অভাবে অবর্ণনীয় মানসিক আকাঙ্ক্ষা এবং বিপুল শারীরিক কষ্ট। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যদি কোনও ভাবে ধূমপান ছেড়ে ৩০ দিন থাকা যায়, তবে এই যুদ্ধ জয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া যাবে। এই বিষয়ে কিছু যুদ্ধকৌশল আছে।

- একটা শুভ দিন ঠিক করুন, যেদিন কাজের চাপ বা উদ্বেগ তেমন কিছু থাকবে না।
- আগের রাত্রে সিগারেট, দেশলাই, অ্যাশট্রে এই সব ফেলে দিন।
- হাত ও মুখকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখুন। যেমন, হাতের জন্য রবারের বল বা গার্ডার; মুখের জন্য ফল বা চিনিবিহীন চিউইংগাম।
- মুখগহ্বর পরিষ্কার ও তাজা রাখুন, মাঝে মাঝে দাঁত ব্রাশ করুন, মাউথওয়াশ দিয়ে কুলকুচি করুন বা মিন্ট দেওয়া চিউইংগাম চিবোন।
- শরীরের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিন। নিজেকে প্রয়োজনে বার বার মনে করিয়ে দিন যে সিগারেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত সব ভেবেচিন্তে আপনি নিজেই নিয়েছেন।
- প্রলোভনের বিরুদ্ধে মনকে ইস্পাত-কঠিন শক্ত করুন। কেউ সিগারেট অফার করলে বলা অভ্যাস করুন, 'না, থ্যাঙ্কস। আমি সিগারেট খাই না।' যদি কেউ জোর করে, তবে বলুন, 'না, ধন্যবাদ, পরে খাবো' কিংবা 'না, খাবো না, গলাটা একটু ব্যথা হয়েছে।'
- টাকা জমানোর একটা কৌটে রাখুন, তাতে রোজ সিগারেট কেনার টাকাটা জমা করুন।
- যে সমস্ত জায়গা বা পরিস্থিতি ধূমপানের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে, সেসব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।
- শারীরিক কার্যকলাপ বাড়ান, যেমন— প্রাতর্ভ্রমণ, সাইকেল চড়া কিংবা সাঁতার। সিগারেট না খেলে ওগুলো বেশ সহজ আর আনন্দদায়কই লাগবে।
- মনে রাখতে হবে, রোজ তিনবার করে স্বাভাবিক খাবার খাওয়া দরকার।
- প্রয়োজনে ধূমপানে আসক্তি কমানোর ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন।

ধূমপানে আসক্তি কমানোর ওষুধ :

বিষস্য বিষমৌষধম্! যে সমস্ত বেরিয়েছে তাতে বেশিরভাগ নিকোটিনই থাকে, তবে কম পরিমাণে এবং ওগুলো ফুসফুস বাদে অন্যভাবে শরীরে প্রয়োগ করা হয়। এতে করে নিকোটিন শরীরে ঢোকে স্বল্প ও নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে এবং বেশ ধীরে ধীরে। ধূমপান ছাড়ার শারীরিক ও মানসিক কষ্টের অনেকটাই লাঘব হয় এতে। বেসরকারি স্তরে ভারতের বাজারে এই ওষুধ চিউইংগাম ও চামড়ায় লাগানোর পট্টি হিসেবে পাওয়া যায়, খরচ মাসে ৮০০ থেকে ২৫০০ টাকা। এ দিয়ে ধূমপান ছাড়ানো যায় বটে, তবে শেষপর্যন্ত এটাকেও ছাড়ানো একটা ছোটোখাটো সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও 'ব্যুপ্রোপিয়ন' এবং 'ভ্যারেনিক্লিন' বলে দু'রকমের ট্যাবলেট রয়েছে যেগুলোতে নিকোটিন নেই।

এই প্রবন্ধে ফুসফুসের ক্যানসার সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দেওয়া হলো। ধূমপান ছাড়ার জন্য যে ওষুধগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, এদের ব্যবহার করতে হলে বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

(লেখক ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ)

আমার কি ক্যানসার হয়েছে ডাক্তারবাবু?

অনন্যা চক্রবর্তী

রত্নার বয়েস পঞ্চাশ বছর। দিব্যি সুস্থ মানুষ কিন্তু হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলেন হেয়ারলাইন ও কানের মধ্যবর্তী অংশে একটি ছোটো সিস্ট। প্রথমে পাত্তা দেননি। কিন্তু সিস্টটি ক্রমশ বাড়তে থাকায় প্রথমে পাড়ার ডাক্তারবাবু এবং কিছুদিন পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যেতে হলো। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সিস্টটি পরীক্ষা করে বায়োপসি করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। এদিকে বায়োপসি কী এবং ডাক্তারবাবুরা কেন এই পরীক্ষা করানোর কথা বলেন সেটা রত্না ভালোই জানেন। সুতরাং তিনি সেই মোক্ষম প্রশ্নটি ডাক্তারবাবুকে করে বসলেন যেটি দিয়ে আমরা এই নিবন্ধের শিরোনাম করেছি— আমার কি ক্যানসার হয়েছে ডাক্তারবাবু?

বস্তুত এই প্রশ্ন এবং তার হ্যাঁ-বাচক উত্তর একজন মানুষকে মানসিক ভাবে শেষ করে দিতে পারে। ক্যানসার হবার ভয় এবং হলে তার চিকিৎসাকালীন প্রতিটি মুহূর্তে রোগীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সারাক্ষণ মৃত্যুভয় তো আছেই সেইসঙ্গে আছে জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত নেতিবাচক মনোভাব। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই আতঙ্কের নাম কারসিনোফোবিয়া। কিন্তু কেমন তার লক্ষণ— সংক্ষেপে সেই আলোচনা এখানে করা যেতে পারে।

- সবসময়েই মনে হয় খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে।
- পরিচিত প্রত্যেককেই রোগী জিজ্ঞাসা করে তারা তাকে কেমন দেখছে বা রোগীর এখন কী করা উচিত বলে তাদের ধারণা।
- পরিবর্তিত রুটিনের সঙ্গে রোগীর খাপ খাওয়াতে না পারা।
- নেতিবাচক ভাবনাচিন্তার বৃদ্ধি।
- অস্বাভাবিক ভয় এবং দুশ্চিন্তা।
- মনঃসংযোগের অভাব।
- চোখেমুখে সবসময় টেনশনের ছাপ।
- মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠা।
- প্রায়শই গলা শুকিয়ে যাওয়া।
- অসহিষ্ণুতা এবং সামান্য কারণে রেগে যাওয়া।
- প্যানিক অ্যাটাক।

রত্নার বায়োপসি রিপোর্ট আসার পর দেখা গেল ওর গলায় বাসা বেঁধেছে ক্যানসার। ক্রমশ রত্নার আচরণে ফুটে উঠল নিদারুণ ভয় আর দুশ্চিন্তা। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি অস্বাভাবিকতা সকলের চোখে পড়ল। যেমন— সারাদিন একা থাকতে চাওয়া, খিদে ও ঘুম কমে যাওয়া, ভুল চিকিৎসার আশঙ্কা, নৈরাশ্য, যে-সব কাজ করতে রত্না আগে পছন্দ

ক্যানসারের উপসর্গ : ব্রেস্ট

১. স্তনে বা বাহুমূলে মাংসপিণ্ড। ২. স্তন ফুলে যাওয়া। ৩. স্তনে চুলকানি বা টোল পড়া। ৪. স্তনবৃন্ত লাল হয়ে ওঠা। ৫. স্তনবৃন্তের ভেতরে ঢুকে যাওয়া এবং যন্ত্রণা। ৬. শিশুকে স্তন্যপানের পর রক্তমিশ্রিত সাদা তরল বের হওয়া। ৭. স্তনের আকৃতির পরিবর্তন। ৮. স্তন এবং চারপাশে যন্ত্রণা।

ক্যানসারের উপসর্গ

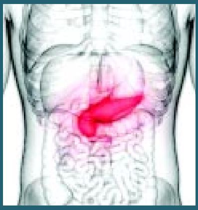

প্যানক্রিয়াস

১. পেট ও পিঠে যন্ত্রণা। ২. খিদে কমে যাওয়া এবং অস্বাভাবিক ওজন হ্রাস। ৩. ত্বকে হলুদ ভাব এবং চোখ সাদা হয়ে যাওয়া। ৪. সাদা পায়খানা। ৫. কালো প্রস্রাব। ৬. চুলকানি। ৭. ডায়াবেটিস। ৮. রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া।

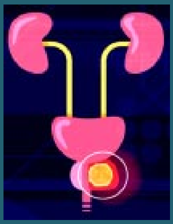

প্রোস্টেট ক্যানসার

১. প্রস্রাবে সমস্যা। ২. থেমে থেমে অনেকক্ষণ ধরে প্রস্রাব। ৩. রাতে বারবার প্রস্রাব। ৪. প্রস্রাব পুরোপুরি না হওয়া। ৫. প্রস্রাব করার সময় যন্ত্রণা। ৬. প্রস্রাবে রক্ত।

করতেন— সেসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া এবং বেঁচে থাকার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলা। রত্নার স্বামী অশোক মনোবিদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি জানিয়ে দিলেন রত্নার এখন কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়।

● **ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার :** চিকিৎসায় ফল মিলবে কিনা জানার জন্য ক্যানসার রোগীরা ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করেন। মনে রাখবেন ভুলভাল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত কোনও লেখা পড়লে আপনার আতঙ্ক আরও বেড়ে যেতে পারে। তাই লেখা পড়ার আগে জেনে নিন লেখকের পর্যাপ্ত পেশাগত প্রশিক্ষণ আছে কিনা।

● **মনকে বলুন আমি আর ভয় করব না :** এর জন্য দরকার একটি প্ল্যান। যেসব ভাবনা মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে তেমন ভাবনা মনে আসতে দেওয়া চলবে না। যাদের সব থেকে ভালোবাসেন তাদের সঙ্গে থাকুন। গান শুনুন, বই পড়ুন এবং অবশ্যই ধ্যান করুন।

● **বন্ধু খুঁজুন বিশ্বময় :** সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে আপনার বন্ধুরা। বিশেষ করে ক্যানসার সারিয়ে যারা ফিরে এসেছেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন। তারা বলে দেবেন কীভাবে আপনি ভয় থেকে বেরিয়ে আসবেন। কারণ এই ভয় তারাও একদিন পেয়েছেন এবং জয়ও করেছেন।

● **নিজেকে আরও শিক্ষিত করে তুলুন :** ডাক্তারবাবু এবং চিকিৎসাকর্মীদের জিজ্ঞাসা করুন আপনার কী হয়েছে। চিকিৎসা- সংক্রান্ত যে-কোনও প্রশ্ন ওদের করুন। বিশেষ করে আপনার হেলদি লাইফস্টাইল কী হতে পারে জেনে নিন ওদের কাছে।

সব শেষে একটাই কথা। সব ক্যানসারে মৃত্যু হয় না। মনকে শক্ত করে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সহযোগিতা করলে দেখবেন, একদিন আপনিও সেরে গেছেন।

ক্যানসার রোগীকে সরকারি সাহায্য

- কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক রাষ্ট্রীয় আরোগ্য নিধি প্রকল্পের আওতায় দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ক্যানসার রোগীকে আর্থিক সাহায্য করে। এই সুবিধা পেতে মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে। তারপর নিয়ম মেনে ফর্ম ফিলআপ করে বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র এবং রেশন কার্ডের স্ক্যানড কপি-সহ অনলাইনে জমা দিতে হবে।
- যেসব জায়গায় সরকারি হাসপাতাল ক্যানসার রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে অপারগ, সেখানকার রোগীদের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ফান্ড রয়েছে। এই ফান্ড থেকে গরিব রোগীদের ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়। পারিবারিক আয় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার কম হলে ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা খরচের ৭০ শতাংশ বহন করে কেন্দ্র। নিয়মাবলী মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
- কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ক্যানসার চিকিৎসার খরচ বহন করে কেন্দ্র। জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতির আওতায় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে যারা নাম নথিভুক্ত করেছেন তারা ক্যানসার-সহ বিবিধ চিকিৎসায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান পাবেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ ফান্ড থেকেও ক্যানসার রোগীদের আর্থিক সাহায্য করা হয়। নিয়মাবলী সরকারি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
- রাজ্য সরকারের চিকিৎসা অনুদান ফান্ড থেকেও ক্যানসার রোগীদের ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়া হয়। তবে এই সুবিধে মিলবে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করালে। নিয়মাবলী রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

বিদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

লালা হরদয়াল

স্বামী রামতীর্থ ও অধ্যাপক ধরমবীরের সমালোচনাতে নিরহংকারী, একাধারে সশস্ত্র বিপ্লবচেতনার মশালবাহক এবং বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতির বিশ্লেষক লালা হরদয়াল ছিলেন এক ঋষিতুল্য, সর্বত্যাগী মানুষ।

কৌশিক রায়

ঋষি অরবিন্দ ঘোষ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো অগ্নিযুগের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকবাদের বুক কাঁপানো বিপ্লবীদ্বয়ের সঙ্গে বীরভূমি পঞ্জাবের এক বিপ্লবীর একটি বিষয়ে মিল আছে। অরবিন্দ-নেতাজীর মতো ইনিও সর্বোচ্চ চাকুরির পরীক্ষা— ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েও দেশমাতৃকার পরাধীনতার শ্বেতাঙ্গ শৃঙ্খলমোচনে সেই যশ-খ্যাতিকে ধূলিমুষ্টির মতো অবহেলাভরে পরিত্যাগ করেন। আত্মনিয়োগ করেন ভারতভূমি থেকে বিজাতীয় শাসনতন্ত্র বিতাড়নে। এই মহান দেশপ্রেমিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নেতাজী, মাদাম ভিকাজী রুস্তম কামা, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, মানবেন্দ্রনাথ রায় ও রাসবিহারী বসুর মতোই বেছে নিয়েছিলেন বিদেশের মাটিকে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ভোলি রানি ও গৌরী দয়াল মাথুরের কৃতী সন্তান এই বিপ্লবী হলেন লালা হরদয়াল সিংহ মাথুর।

কিশোরবেলা থেকেই কার্লমার্ক্স ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস রচিত 'ডাস ক্যাপিটাল' ও 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো', ইতালীয় বিপ্লবী ম্যাৎসিনির জীবনী, ফ্রান্সকে ইংরেজ আধিপত্য থেকে মুক্ত করা কৃষকদুহিতা জোয়ান অব আর্ক-এর বীরত্বের কথা এবং মোগল বিরোধী মহারানা প্রতাপ সিংহের বীরগাথা পাঠ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন লালা হরদয়াল। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর 'সত্যার্থ প্রকাশ' বইটি এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বাণী পাঠ করে ভারতের ভূলুণ্ঠিত, চিরায়ত বৈদিক ঐতিহ্য এবং স্বাধীন সত্তাকে পুনরুদ্ধার করার জন্যও আগ্রহী হয়ে ওঠেন লালা হরদয়াল। এর পরে, যৌবনকালে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে 'অভিনব ভারত'-এর দূরদর্শী প্রতিষ্ঠাতা বিনায়ক বীর দামোদর সাভারকার, লন্ডন প্রবাসী বিপ্লবী ও 'ক্লক অ্যান্ড ড্যাগার' নামক গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার অন্যতম চালক শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা এবং 'ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী' মাদাম কামার সঙ্গে। সোভিয়েত সমাজ-দার্শনিক মিখাইল বাকুনিন-এর স্বাধীন মতবাদেরও ভক্ত ছিলেন তিনি। আগ্রহী হয়েছিলেন লাতিন আমেরিকা থেকে স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটনো বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক সিমোন বোলিভারের জীবন দর্শনের প্রতি। ঈশ্বরজ্ঞানে মানবসেবা, বিশ্বশান্তির পূজারি এবং বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত সাম্যনীতির ভক্ত হিসেবে লালা হরদয়ালের প্রশংসা করেছেন তাঁর দুই জীবনীকার— এমিলি ব্রাউন ও য়ুরগেন্‌স্ মেয়ার।

লালা হরদয়ালের বিদ্যাভ্যাস হয়েছিল ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়েই। কেমব্রিজ মিশন স্কুলে পড়ার পর তিনি অবশ্য দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্‌স কলেজ থেকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করলেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পর মেধাবী লালা হরদয়াল

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর সংস্কৃত পাঠ্যক্রম নিয়ে পড়ার জন্য দুটি বৃত্তি পেলেন। ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করার সময়েই 'ইন্ডিয়ান সোশিয়োলজিস্ট' পত্রিকাতে একটি পত্রনিবন্ধে লিখলেন— 'ভারতের কাজ শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকারের পরিবর্তনই নয়— তাকে সমূলে বিনষ্ট করা।' বলাই বাহুল্য, এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ পুলিশের কুনজরে পড়লেন তিনি। 'দ্য ইন্ডিয়ান সোসিয়োলজিস্ট' পত্রিকার সম্পাদক গাই অ্যালড্রেডের বন্ধুত্বও অর্জন করলেন হরদয়াল। লালা লাজপত রায়ের পরামর্শক্রমে তিনি বিদেশেই থাকতে শুরু করলেন। প্যারিস থেকে 'বন্দে মাতরম্' নামক একটি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রও প্রকাশ করতে শুরু করলেন। তবে, প্যারিসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর মনঃপূত হলো না। উত্তর আফ্রিকার আরবিভাষী দেশ আলজেরিয়াতে গিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলতে লাগলেন। ফরাসি অধিকৃত মার্তিনিক দ্বীপে প্রায় সন্ন্যাসীর মতো থাকতে শুরু করলেন। সেখানে নিভৃতাবাসে তাঁর খাদ্য ছিল আলুসিদ্ধ ও ফেনা ভাত। শুতেন সামান্য একটি মাদুর, সতরঞ্জি বিছানো কাঠের পাটাতনের ওপর। এই সময়ে আর্য সমাজের প্রতিনিধি এবং অন্যতম সক্রিয়, চরমপন্থী বিপ্লবী ভাই পরমানন্দের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁর অনুরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বিপ্লববাদের প্রচারে ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের বস্টন শহর থেকে ক্যালিফোর্নিয়া গেলেন লালা হরদয়াল। সেখানকার ভারতীয় অধিবাসীদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করলো তাঁর বক্তৃতাবলী। হাওয়াই দ্বীপের ওয়াইকিকি সমুদ্রতীরে একটি ধ্যানকেন্দ্রও গড়ে তুললেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইংরেজি সাময়িকী 'মডার্ন রিভিউ'তে তাঁর কয়েকটি জাতীয়তাবাদী নিবন্ধ প্রকাশিত হলো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রিৎজ উল্‌ফহাইম-এর সহায়তায় লালা হরদয়াল শিল্প কারখানার শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি এবং দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। শ্রমিকদের ব্রিটিশ মালিক ও পুঁজিপতিদের শোষণের বিরুদ্ধে ধর্মঘটেরও অধিকার ব্যাখ্যা করলেন তিনি। দুই সাম্যবাদী এবং নির্বাসিত মেক্সিকান শ্রমিকনেতা— রিকার্দো ও এনরিকে ফ্লোরেস ম্যাগোনের আদর্শে তিনি, 'বাকুমিন ইনস্টিটিউট অব ক্যালিফোর্নিয়া' নামক আরেকটি জাতীয়তাবাদী সংস্থা গড়ে তুললেন। এই সময়েই মার্কিন দেশের স্টকটন এবং কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা শোষিত শিখ কৃষকদের সমর্থন পেলেন তিনি। স্টকটনের এক ধনী শিখ কৃষক-জোওয়াশ সিংহ, অর্থসাহায্য করলেন লালা হরদয়ালকে। তেজ সিংহ, তারকনাথ দাস ও আর্থার পোপ-এর সহযোগিতায় বিদেশে আগাত মেধাবী ভারতীয় শিক্ষার্থীদের আর্থিক ব্যয়ভার বহনের জন্য 'গুরু গোবিন্দ সিংহ সাহিব এডুকেশন্যাল স্কলারশিপ নামক একটি উদ্যোগ শুরু করলেন লালা হরদয়াল। সহায়তা পেলেন লন্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার দ্বারা স্থাপিত 'ইন্ডিয়া হাউস' নামক বিপ্লবী সংগঠনটি থেকেও।

১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর, তদানীন্তন ভারতের ভাইসরয় বা বড়লাট— লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন রাসবিহারী বসুর বন্ধু বসন্ত কুমার বিশ্বাস নামক এক তরুণ বিপ্লবী। এই দুঃসাহসিকতাকে ভারতীয় চরমপন্থার এক জ্বলন্ত উদাহরণরূপে মার্কিন প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠন নালন্দা ক্লাবে পেশ করা বক্তব্যে উপস্থাপিত করলেন লালা হরদয়াল। বসন্ত বিশ্বাসের সাহসিকতার প্রশংসা করে 'যুগান্তর সার্কুলার' নামক একটি জাতীয়তাবাদী প্রচার পুস্তিকাও প্রকাশ করলেন লালা হরদয়াল। সেখানে তিনি ওই বাঙ্গালি বিপ্লবীকে 'Moral Dynamite' (নৈতিক বিস্ফোরক), 'The Esparanto of Rovolution' (বিপ্লবের বিশ্বজনীন ভাষা) এবং 'Herbinger of Hope and Courage' (আশা ও সাহসের বার্তাবহ) রূপে ব্যাখ্যা করলেন।

লালা হরদয়ালের গড়ে তোলা 'বার্লিন কমিটি' বা 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি'-ই পরে 'গদর পার্টি' নামে পরিচিত হয়। এর ফলে জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মতবাদ প্রচারের অভিযোগে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন পুলিশ গ্রেপ্তার করে লালা হরদয়ালকে। ছদ্মবেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ মিত্রশক্তির শত্রু জার্মানির রাজধানী বার্লিনে পালিয়ে যান লালা হরদয়াল। নেতাজীও পরবর্তীকালে বার্লিন থেকেই তাঁর সামরিক শক্তির স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন। জার্মান গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গেও নিবিড় সংযোগ ছিল জার্মান, ইংরেজি ও ইতালীয় ভাষাতে দক্ষ লালা হরদয়ালের। সুইডেনেও বেশ কিছুদিন ছিলেন ভারতীয় বিপ্লবের বিশ্বনাগরিক লালা হরদয়াল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শহরে একটি সভাতে ভাষণ দেওয়ার পরই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় ৫৪ বছর বয়সি লালা হরদয়ালের। স্থানীয় চিকিৎসকরা তাঁর মৃত্যুকে হৃদরোগজনিত বললেও 'ভারতমাতা সোসাইটি' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও লালা হরদয়ালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হনুমন্ত সহায় সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন— ব্রিটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দারা লালা হরদয়ালের খাবারে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যা করেছে। স্বামী রামতীর্থ ও অধ্যাপক ধরমবীরের সমালোচনাতে নিরহংকারী, একাধারে সশস্ত্র বিপ্লবচেতনার মশালবাহক এবং বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতির বিশ্লেষক লালা হরদয়াল ছিলেন এক ঋষিতুল্য, সর্বত্যাগী মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দের বাক্য যার কর্মযোগে ব্যাপ্ত ছিল— 'ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ।' ◘

ভাগীরথীর গ্রাসে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ

স্বপন দাশগুপ্ত

রাজা শশাঙ্ক ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ মতান্তরে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে গৌড়রাজ্য শাসন করেন। ঐতিহাসিকদের মতে রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালেই বঙ্গদেশ, বাঙ্গালি জাতি ও বঙ্গ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের সূচনা হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা কিছুদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণ দখল করেন। তাঁর 'নিধানপুর তাম্রপত্র' থেকে এই বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কর্ণসূবর্ণ নগরের সঠিক অবস্থান এখনও নির্ণীত হয়নি। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে স্থানটি ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী রাঙামাটি গ্রাম এলাকায়। কর্ণসুবর্ণ নগরীর ধ্বংসাবশেষ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার 'কানাসোনা' অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি ব্রহ্মপুরের দক্ষিণ পশ্চিমের ৯.৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ব্রহ্মপুর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান কার্যালয় ছিল। কথিত আছে কর্ণসুবর্ণ অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী ছিল। কৌরব রাজকুমার দুর্যোধন বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ওই রাজ্য পাণ্ডব-জননী কুন্তীর প্রথম সন্তান কর্ণকে উপহার দিয়েছিলেন।

পরিবহণ ব্যবস্থা :

কর্ণসুবর্ণ রেলওয়ে স্টেশনের পূর্বতন নাম ছিল 'চিরুতি'। এটি পূর্ব রেলওয়ের আজিমগঞ্জ-কাটোয়া লুপ লাইনের একটি অংশ। কিছু প্যাসেঞ্জার ও কিছু এক্সপ্রেস ট্রেন এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করত। সদরে বা প্রধান কার্যালয়ে যাবার জন্য বাস, সাইকেল, ভ্যান, রিকশা প্রভৃতি আঞ্চলিক পরিবহণও চালু ছিল। ১৯১৩ সালে হুগলি-কাটোয়া রেলওয়ে ব্যান্ডেল থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া একটা ব্রডগেজ লাইন তৈরি করে। ১৯৭১ সালে ফারাক্কা বাঁধ ও রেলওয়ে তৈরি হবার ফলে এই অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থার ছবিটি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। কর্ণসুবর্ণ থেকে হাওড়ার রেলদূরত্ব প্রায় ১৯২ কিলোমিটার।

'কর্ণসুবর্ণ' সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত :

কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃতান্ত ব্যতীত অন্য কোনো লিখিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্ণসুবর্ণ ও রক্তমৃত্তিকা- বিহারের সমৃদ্ধ শহরাঞ্চল সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তই একমাত্র প্রামাণ্য লিখিত দলিল। হিউয়েন সাঙ মেদিনীপুরের 'তাম্রলিপ্ত' (বর্তমানে তমলুক) থেকে রাজধানী কর্ণসুবর্ণের নিকটস্থ রক্তমৃত্তিকা বিহার পর্যন্ত ভ্রমণ করে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি কর্ণসুবর্ণের ভৌগোলিক সীমা, আয়তন, কৃষি সম্পদ ও জলবায়ুর উল্লেখ করেছেন। তিনি এই নগরীর অধিবাসীদের আচার আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তাঁর মতে কর্ণসুবর্ণবাসীরা সৎ, অমায়িক, বিদ্যোৎসাহী ও সম্পদশালী ছিল। হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবর্ণে এবং নগরীর উপকণ্ঠে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার, সঙ্ঘারাম, স্তূপ ও দেবমন্দির দেখেছিলেন। বৌদ্ধবিহারগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল লো-তে-উহ-চি বা রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার।

যদুপুরের রাজবাড়িডাঙা খননকার্য :

বাঙ্গলার এই প্রাচীন রাজধানীর ভৌগোলিক অবস্থান দীর্ঘকাল অজ্ঞাত ছিল। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক তথা ঐতিহাসিকরা বাঙ্গলা বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান নির্দেশ করেছেন কিন্তু কোনোটাই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনভিত্তিক নয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বেভারিক মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী তীরবর্তী রাঙামাটি অঞ্চলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান ছিল বলে অনুমান করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-ফরাক্কা এবং হাওড়া- নিমতাশাখার 'চিরুটি' স্টেশনের (বর্তমান নাম কর্ণসুবর্ণ) অদূরে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ব্রহ্মপুর থানার 'রাজবাড়িডাঙা' নামে একটা অনুচ্চ ঢিবিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ড. সুধীর রঞ্জন দাসের তত্ত্বাবধানে উৎখনন শুরু করেন। ঢিবিটির আয়তন ৪৬৭৭৬.৬ বর্গমিটার এবং উচ্চতা কৃষিজমি থেকে ৩.৬৫—৪.২৭ মিটার। এখানে ব্যাপক খননকার্যের ফলে বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়, প্রমাণিত হয়, এখানেই ছিল রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার।

এই খননকার্যে বিভিন্ন গঠন কৌশলের

ছয়টি পর্যায় ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মঞ্চের অংশ, মাটির নীচে স্তূপের মতো দুটি গোলাকারতল (সম্ভবত বাড়ির ভিত) এবং চুন দিয়ে প্লাস্টার করা সিঁড়ি। প্রথম পর্যায়ের সৌধমালা নির্মিত হয়েছিল ভূমির উপর, ভাগীরথীর প্লাবনে তা বিধ্বস্ত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের সৌধমালা সেই ধ্বংসস্তূপের উপর বন্যাবাহিত পলিমাটির উপর নির্মিত। এই পর্যায়ের দেওয়ালের ভিতে একটি নরমুণ্ড পাওয়া যায়। অনুমান, ভিত সুদৃঢ় করার জন্য একসময় নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। তৃতীয় পর্যায়ের সৌধমালায় প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সোপানশ্রেণী এবং তার দুইপাশে স্তূপের দুটি গোলাকার ভিত্তি পাওয়া যায়।

চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে পাওয়া যায় দেওয়াল বেষ্টনীর চারদিকে চতুষ্কোণ বেদি, চুনের পলেস্তরাযুক্ত মেঝে, ষষ্ঠ পর্যায়ে ইঁট বিছানো প্রাঙ্গণে খুঁটি পোতার গর্ত এবং মেঝে আর দেওয়াল পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পর্যায় থেকে সৌধমালার সামগ্রিক পরিকল্পনাটি ফুটে উঠলেও আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

আবিষ্কৃত সৌধমালার কালনির্ণয় :

আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর ভিত্তি সৌধমালার ছয়টি কালনির্ণয় সম্ভব হয়েছে। প্রথম দুটি পর্যায় সিলমোহর যুগের আগেকার। নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয়, তৃতীয় থেকে চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী। তৃতীয় পর্যায় হিউয়েন সাঙের সমসাময়িক (সপ্তম শতাব্দী)। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত অগ্নিদগ্ধ শস্যভাণ্ডারের চাল-গম রেডিয়ো-কার্বন পদ্ধতিতে পরীক্ষায় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সবদিক বিচারে কর্ণসুবর্ণ তৎকালে বণিক, ধর্মীয় সম্প্রদায়, ভ্রমণকারী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল। উঁচু ঢিপি দ্বারা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য কর্ণসুবর্ণ রাজা শশাঙ্কের পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। রাজবাড়িডাঙ্গা খননের অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন ঘটনায় পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদের কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে বহুকালের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হয়েছে। রাজবাড়িডাঙ্গার লোকবসতি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর পরই এই অঞ্চল পরিত্যক্ত হয়।

প্রতাপপুরের 'রাক্ষসীডাঙ্গা' খননকার্য :

সন্ন্যাসীডাঙা, রাজবাড়িডাঙা, ভীমবতীজলা এবং নীলকুঠি ঢিবি দ্বারা পরিবেষ্টিত অঞ্চল রাক্ষসীডাঙা। ঢিবিটি রাজবাড়িডাঙার নিকটস্থ। এই ঢিবি রাজবাড়িডাঙা অপেক্ষা ৪.৫ মিটার উঁচু। ভগ্নপ্রায় প্রাচীরকে ঘিরে প্রত্যেকটি ১০×৪ মিটার মাপের তিনটি কক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে। সংকীর্ণ রাস্তা এবং খোলা প্রবেশদ্বার আছে। এখানকার ব্যবহৃত হস্তনির্মিত ইঁট পাল-পূর্ববর্তী যুগেও পাওয়া গেছে। খননের ফলে মাটির পাত্র, স্টাকো মুণ্ড, বাড়িতে ব্যবহৃত মাটির বাসন, কড়া এবং লৌহ ও তামার নিত্য ব্যবহার্য বাসনপত্র পাওয়া গেছে। তাছাড়া পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি ও ময়ূরের অংশও পাওয়া গেছে। তৃতীয় শতাব্দীর অনুরূপ ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত সিলমোহরের সন্ধান মিলেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভাগীয় প্রধান সুস্মিতা বসু মজুমদারের মতে সিলমোহরগুলি সপ্তম শতকে এবং সেগুলি রাজকীয় নয়।

রাজবাড়িডাঙা ও রাক্ষসীডাঙার সিলমোহর :

প্রাপ্ত সিলমোহরের উপরে ধর্মচক্র এবং দুপাশে দুটি হরিণের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। নীচে লেখা এই সিলমোহর রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের বৌদ্ধভিক্ষুদের। রক্তমৃত্তিকা নামযুক্ত আরও কয়েকটা সিলমোহর পাওয়া গেছে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে মালয় উপদ্বীপে প্রাপ্ত শ্লেট-পাথরের একটি লেখাতেও রক্তমৃত্তিকা বিহারের নাম পাওয়া যায়। নালন্দা, পাহাড়পুর ও রত্নগিরি বৌদ্ধবিহারেও এই ধরনের সিলমোহর পাওয়া গেছে। লিপিতত্ত্ব বিচারে সিলমোহরগুলি সপ্তম শতকের বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এই থেকেই প্রমাণিত হয় যে হিউয়েন সাঙ বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারটির সন্নিহিত অঞ্চলেই গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরী গড়ে উঠেছিল যার অধিকাংশ এখন ভাগীরথীর গর্ভে। রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে গৌড় সামাজিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু এই খ্যাতি অস্থায়ী ছিল। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতেই কর্ণসুবর্ণ যে গৌরব অর্জন করেছিল এই শতাব্দীরই শেষার্ধে তা বিস্মৃতির দিকে এগিয়ে যায়। অতীব দুঃখের বিষয় পরবর্তী পাল ও সেন রাজাদের শাসনকালে এই গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী শহরের কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। ধীরে ধীরে বাঙ্গলার ঐতিহাসিক মানচিত্রে কর্ণসুবর্ণ হারিয়ে যায়। আজকের বাঙ্গালির কাছে কর্ণসুবর্ণ, রক্তমৃত্তিকা বা শশাঙ্কদেব নামগুলো কোনো বার্তা বহন করে না। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে কিছু পাতায় হয়তো তা আবদ্ধ হয়ে আছে। সেদিনের বাঙ্গলার গৌরবোজ্জ্বল রাজধানী আজ গোচারণক্ষেত্র। ভাঙনের ফলে অনেক চিহ্ন মুছে গিয়েছে কিন্তু সম্রাট অশোকের সময় থেকে চলে আসা মাটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে গ্রামের কতিপয় পরিবার। রাজা শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য পোড়ামাটির শিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ কর্ণসুবর্ণের অধিকাংশ বাড়িতে তখন পোড়ামাটির বাসনপত্র থেকে শুরু করে গৃহস্থালীর নানা সামগ্রী ও সরঞ্জাম ব্যবহৃত হতো। ড. নীহার রঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' ও দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত পুস্তক 'বৃহৎ বঙ্গ' এই ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রাজা শশাঙ্কের ভাবনার বাস্তবয়নে জোর দিয়েছিলেন কাঁঠালিয়ার মতো কয়েকটি গ্রাম। শুধু মাটির থালা বাসন নয়, এই গ্রামগুলিতে গড়ে উঠেছিল মাটির পুতুল তৈরির কারখানা। কলকাতার শিল্পগ্রামে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে শশাঙ্কের আমলের পোড়া মাটির সামগ্রী রাখা আছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তোষণনীতির ফলে ইসলামি যুগকে গুরুত্ব দিয়ে বাঙ্গলার তথা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অবহেলা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বাঙ্গলার শাসকদল রাজধানী শহরের ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষিত করার পরিবর্তে অবহেলায় আরও বিনাশের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। □

তিন শতাধিক বছরের প্রাচীন যাদুয়া মাতার মন্দির

সপ্তর্ষি ঘোষ

কিছুদিন আগে শেষ হয়েছে শারদীয়া দুর্গাপূজা। অর্থাৎ বাঙ্গালির সর্বশ্রেষ্ঠ পার্বণ সম্পন্ন হয়েছে। দেখতে দেখতে যেন দ্রুত কেটে গেল দিনগুলি। উমা ফিরে গেছেন কৈলাসে। আবার এক বছরের প্রতীক্ষা। তবে উৎসবের রেশ কিন্তু এখনও রয়ে গেছে। যদিও করোনার প্রকোপে এবছর পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনেকটাই ব্যতিক্রমী। দুর্গাপুজোর অব্যবহিত পরেই আসেন মা দুর্গার কন্যা লক্ষ্মী দেবী। এরপর শুরু হয়ে যায় আর এক মাকে আরাধনা করার প্রস্তুতি। তিনি শক্তিরূপিণী দেবী কালিকা। তাঁর ভক্তের সংখ্যাও অগণিত। মায়ের বিভিন্ন রূপের অন্যতমা হচ্ছেন দেবী কালিকা। দেবী কালিকা সমগ্র জগৎ সংসারকে অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করেন তাঁর ভয়ংকরী রূপ প্রকাশের মাধ্যমে। আসলে তাঁর এই রূপ প্রকাশ এবং ধরাধামে আসার উদ্দেশ্য জগতের কল্যাণ সাধন। আমরা তাঁর সন্তানরা প্রস্তুত হই মাকে সাদরে বরণ করে নিতে। সর্বজনীন পুজোয় থাকে জাঁকজমকের আতিশয্য। কিন্তু মাতৃপূজার আসল উপাচার তো নিষ্ঠা, ভক্তি ও শুদ্ধাচার, যা দেখা যায় বনেদি বাড়ির পুজোয়। সে কারণে বাড়ির পুজোয় থাকে এক পবিত্র ও ভাবগম্ভীর পরিবেশ। আর এরকম পুজো যদি হয় কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে, তাহলে সেই পুজোয় যেতে ইচ্ছে করে বার বার।

এরকমই এক মা কালীর আরাধনা হয় কলকাতা থেকে ১১৬ কিলোমিটার দূরে, বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার মেড়তলা গ্রামের ভট্টাচার্য পরিবারে। তিন শতাধিক বছরের প্রাচীন ‘যাদুয়া মাতা’র পুজো। পুজোর সূচনা করেন পরিবারের আদিপুরুষ শ্রীশ্রী রাজারাম তর্কবাগীশ। তিনি এখনকার বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গুরনাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কীভাবে দেবী ‘যাদুয়া মাতা’ মেড়তলা গ্রামে এলেন, সে অন্য কাহিনি।

তিনশো বছর আগে নবদ্বীপ ছিল বঙ্গদেশের শাস্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্র। এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এলেন শ্রীশ্রী রাজারাম। বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করে পরিব্রাজকরূপে দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক সিদ্ধপুরুষের সাহচর্য ও আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে তিনি জপ ও যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে সেই সিদ্ধপুরুষ রাজারামকে অষ্টধাতুর ‘যাদুয়া মাতা’র বিগ্রহ দান করেন।

‘যাদুয়া মাতা’র বিগ্রহকে কাপড়ের আচ্ছাদন করে রাজারাম ভাগীরথীর পশ্চিমকূল বরাবর পরিক্রমা করতে করতে পূর্বস্থলী থানার মেড়তলা গ্রামে উপস্থিত হন। গ্রামবাসীদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় রাজারাম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ‘যাদুয়া মাতা’কে মেড়তলার গোঁসাই পাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন। ‘যাদুয়া মাতা’ শক্তিদেবী ও কালীমূর্তি। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ইনি অত্যন্ত জাগ্রতা। দেবীর কাছে মানত করে অনেকের মনস্কামনা পূরণ হয়েছে।

জনশ্রুতি, বহু বছর আগে যাদুয়া মাতার মন্দির থেকে অষ্টধাতুর কালীমূর্তি চুরি যায়। পরিবারের সদস্যেরা সেই সময় তাৎক্ষণিকভাবে অবিকল দেবীর একটি মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করেন মন্দিরে। পরবর্তীকালে ভাগীরথীর পাড় থেকে চুরি যাওয়া মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়। সেই থেকে দুই কালী মূর্তিকেই ভট্টাচার্য পরিবার পুজো করে আসছেন। এরপর একজন পরিচিত হন ‘বড়মা’ নামে, অন্যজন ‘ছোটমা’ নামে। এই হলো ‘যাদুয়া মাতা’র মাহাত্ম্য।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, প্রতি বছর কার্তিক মাসের অমাবস্যায় মহা ধুমধাম করে দুই কালীমূর্তির পুজো করা হয়। মূর্তি দুটিকে ঘিরে গ্রামবাসীদের আবেগ রয়েছে। কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যায় তা উৎসবে পরিণত হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু মানুষ মা-কে দর্শন করতে ও পুজো দিতে ‘যাদুয়া মাতা’র মন্দির ভিড় করেন। এছাড়া শনিবার, মঙ্গলবার ও অমাবস্যায় বহু ভক্তের সমাগম হয় মন্দিরে।

কীভাবে যাবেন : ট্রেনে ব্যান্ডেল কাটোয়া শাখায় মেড়তলা স্টেশনে নেমে অটো বা টোটো করে ‘যাদুয়া মাতা’র মন্দিরে পৌঁছানো যাবে। স্টেশন থেকে মন্দিরের দূরত্ব আনুমানিক চার কিলোমিটার। আগ্রহী পাঠক যে কোনওদিন এই প্রাচীন দেবালয় দর্শন করতে যেতে পারেন। আপনি ফিরে আসবেন ‘যাদুয়া মাতা’র আশীর্বাদধন্য হয়ে। ▯

ফঃ ৫

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের আধ্যাত্মিকতা

দীপক খাঁ

একজন ভুবনবিখ্যাত কবি, অপরজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী— তবু তাঁদের বিশ্ববীক্ষণ, তাঁদের ঈশ্বর অনুভব কোথাও যেন এক স্রোতে মিশেছিল।

সালটা ১৯২৬, আইনস্টাইনের কাছ থেকে এক অতি আন্তরিক, হৃদয়স্পর্শী চিঠি পেলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের দেখাসক্ষাৎ ঘটে ওই একই বছরে আইনস্টাইনের বার্লিনের বাড়িতে। পরে ১৯৩০ সালে, আবার দেখা। একবার দুবার নয়, অন্তত চারবার পরস্পরের মুখোমুখী হন বিজ্ঞানী ও কবি। কখনও বার্লিনে, কখনও নিউইয়র্কে। দুজনেই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সংবেদনশীল। দুজনেই পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছেন মনের ভাব— কিন্তু কেউই গেলেন না যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণের মধ্যে। কেউই নিজের মতকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন না। এই সহনশীলতাই আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সংলাপের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। তাঁদের সংলাপের বিশেষ কোনো রেকর্ড নেই। কেউ ধরে রাখেননি তাঁদের বক্তব্যের নির্যাস। শুধুমাত্র দুটি সংলাপ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই দুটি সংলাপ থেকে ধারণা করা যায় আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, ১৯৩০ সালে পঞ্চাশ পেরিয়েছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আর রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ঠিক সত্তর। দুজনেরই জীবনে অভিজ্ঞতা প্রচুর। বাস্তবের প্রতি আইনস্টাইনের বিশ্বাসের মূল কথা হলো— 'Truth is independent of man'। এই কথার অর্থ হলো মানুষ দেখুক চাই না দেখুক, আকাশে চাঁদ তারা আছে, তাতে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ চাঁদ ও তারার অস্তিত্ব মানুষের দেখার উপর নির্ভর করছে না। অ্যাটমের থেকেও ক্ষুদ্রকণা নিয়ে যে অদৃশ্য ভুবন, সেই পৃথিবী যাকে বলা হয় সাব-অ্যাটমিক জগৎ, সেই জগতেও আইনস্টাইনের সত্য সম্পর্কে ধারণা সমান প্রযোজ্য। এই স্থলে আইনস্টাইনের সঙ্গে হাইজেনবার্গ, নীলস্ বোর-এর মতো কোয়ান্টাম থিয়োরির পারঙ্গম বিজ্ঞানীদের মতোবিরোধ। আইনস্টাইন যে চোখে বাস্তবকে দেখতেন, যেভাবে বুঝতেন, সেইভাবে বাস্তবকে দেখেননি রবীন্দ্রনাথ, বোর বা হাইজেনবার্গ। এখানেই তাঁদের গরমিল।

বার্লিনের অদূরে Caputh-এ আইনস্টাইনের গ্রীষ্মনিবাস। ওই বড়িতেই ঘটল রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের এক ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎকারটিকে বলা যায় মৃদুভাষ সংলাপ, ভাব ও ভাবনার এক বিদগ্ধ আদানপ্রদান। দুজনে হয়তো শেষ পর্যন্ত একমত হলেন না। কিন্তু মত পার্থক্যের জন্য কোনো তিক্ততার সৃষ্টিও হলো না। কারণ আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ দুজনে যেন বিশাল গ্রহ, হঠাৎ তারা এসে পড়েছেন কছাকাছি। দুই গ্রহের মধ্যে এ যেন এক মহাজাগতিক সংলাপ।

নিউইয়র্ক টাইমসে তাঁদের এই সাক্ষাৎকার নিয়ে লেখা হয়েছিল এক অনন্য মন্তব্য। —They simple exchanged ideas, But it seemed to an observes as though two plnets here engaged in a chat.

একটি গ্রহ এসেছে অন্য গ্রহের কাছে অতিথি হিসাবে। হঠাৎ আইনস্টাইন বললেন, এই মহাবিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি পৃথক ধারণা চালু আছে। একটি ধারণা অনুসারে এই জগৎ 'একক' হিসেবে মনুষ্যজাতির উপর নির্ভরশীল। অপর ধারণা বলছে, এই মহাবিশ্ব বাস্তব অস্তিত্বের হিসেবে সম্পূর্ণ স্বাধীন, মানুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়।

আইনস্টাইনের এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ থেকে মগ্ন হলেন নিজের ভাবনার মধ্যে। তারপর অকপট বিশ্বাস থেকেই উঠে এল উত্তর— The world is a human world– the scientific view of it is also that of the scientific man. Therefore, the world apart from us does not exist, it is a relative world, depending for its reality upon our consciousness.

বেশ কিছুক্ষণ পরে কথা বললেন আইনস্টাইন— রবীন্দ্রনাথের কথার সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন— Truth then or beauty is not independent of man?

আইনস্টাইনের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন— না, স্বাধীন নয়। রবীন্দ্রনাথের উত্তরে কিছুটা বিস্মিত হলেন আইনস্টাইন। তিনি প্রশ্ন করেন— If there were no human beings

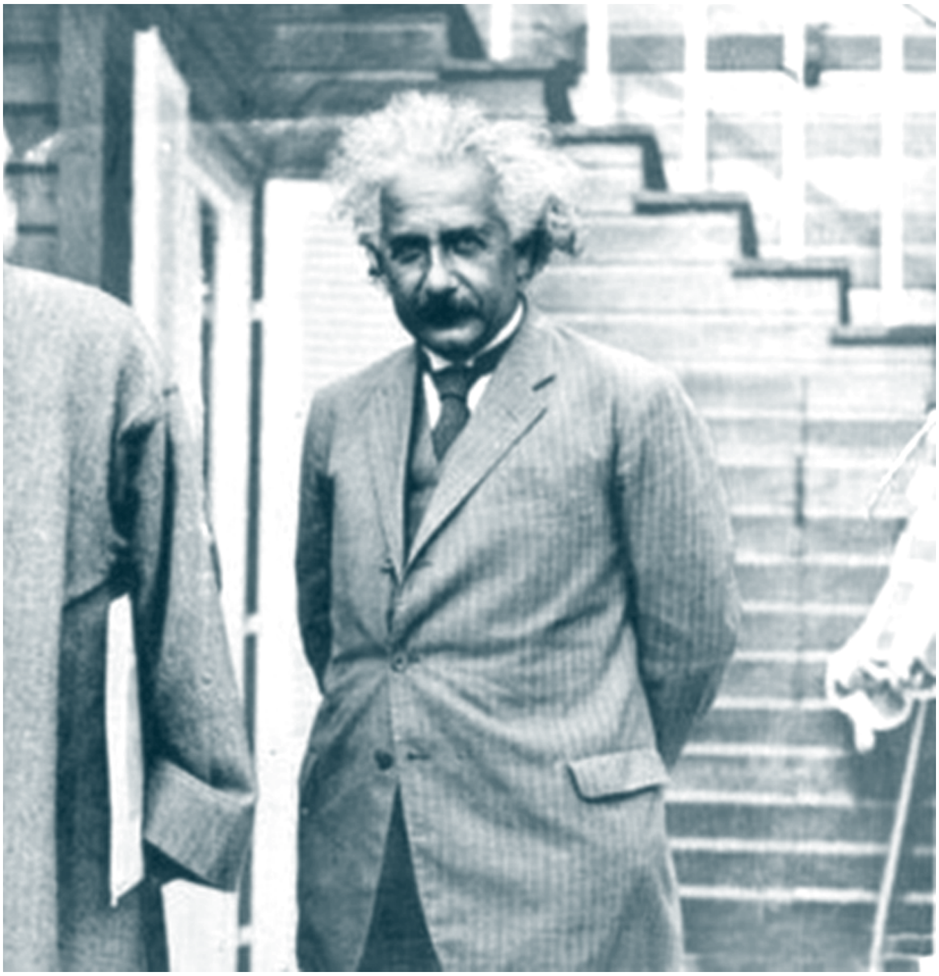

any more, the Apollo Belvedere no longer would be beautiful?

রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত উত্তর— না।

আইনস্টাইন ও বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন— তারপর বললেন— সৌন্দর্য সম্পর্কে আপনার ধারণা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সত্য সম্পর্কে আপনার মতামত আমি মানতে পারছি না।

রবীন্দ্রনাথ বললেন— Why not, truth is realised through man. রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পর অনেকক্ষণ কথা বলেননি আইনস্টাইন। রবীন্দ্রনাথও চুপ। খুবই কোমল স্বরে আইনস্টাইন বললেন— I can not prove my conception is right but that is my religion.

আরও কিছু সময় আলোচনা চলল কিন্তু পরিশেষে আইনস্টাইন নিজ মত প্রকাশ করলেন এই ভাষায়— I can not prove, but I believe in the Pythogorean argument, that the truth is independent to human beings.

রবীন্দ্রনাথ অতি সূক্ষ্মভাবে বিরোধিতা করে বললেন— Brahman is the absolute truth, which can not be conceived by the isolation of the individual mind or described by words.

আইনস্টাইন নীরব না থেকে উত্তরে বললেন, মানুষের মন কিন্তু সেই বাস্তবকেও স্বীকৃতি দেয় যে বাস্তবতা বৃত্তের বাইরে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বর্তমান। যেমন ধরুন এই টেবিলটার কথা। যখন কেউ বাড়িতে নেই, তখনও কিন্তু এই টেবিলটা যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ উত্তর—

Yes it remains outside the individual mind but not the universal mind. The table is that which is perceptible by some kind of consciousness we possess.

আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হলেন না, যুক্তি খাড়া করলেন এই ভাষায়— বাড়িতে কেউ না থাকলেও টেবিলটা যথারীতি থাকবে। কিন্তু আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিমধ্যেই এই বক্তব্য অবৈধ হয়ে পড়েছে। কারণ আমরা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো না, এর মানে কী— এই যে টেবিলটা আমাদের দেখার উপর কোনোভাবে নির্ভর না করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই থেকে যাচ্ছে।

আইনস্টাইন একটু থেমে রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা সুযোগ দিলেন কিছু বলবার জন্য। রবীন্দ্রনাথকে নিরুত্তর দেখে আইনস্টাইন আবার বললেন—

Our natural point of view in regard to the existence of truth apart from humanity cannot be explained or proved, but it is a belief nobody can lack–not even primitive beings.

রবীন্দ্রনাথকে চুপ থাকতে দেখে বিজ্ঞানী আবারও বলেন— We attribute to truth a super human objectivity. It is indispensable for us– this reality which is independent of our existence and our experience and our mind– though we can not say what it means.

এবার রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় ও সংক্ষিপ্তভাবে বললেন— In any case, if there be any truth absolutely unrelated to humanity, then for us it is absolutely non-existing.

তারপর অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আইনস্টাইন তর্কে জিতে গিয়ে উৎফুল্ল হবার ভঙ্গিতে বলেন— Then I am more retigious than you are!

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের এই সাক্ষাৎকারটি পড়ে বলা হয়ে থাকে— 'A complete non meeting of minds.'

আসলে এরা দুজনেই মননশীল, কিন্তু তাঁদের ভাবনার জগৎ ছিল আলাদা। সুতরাং ধরে নেওয়াই যেতে পারে কোনো এক রহস্যময় কারণে তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সম্ভবত দুজনের ভুবনবীক্ষণের কিছুটা একতার জন্য। নিশ্চিত ভাবেই মনে হয়, দুজনেই উপলব্ধি করেছিলেন এক রহস্যময় অস্তিত্ব মহাসৃষ্টির পিছনে। কিন্তু তাঁদের পথ ছিল আলাদা। রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছিলেন এই উপলব্ধিতে অনুভব ও অভিজ্ঞতার আলোকে এবং আইনস্টাইনের পথটি ছিল বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা ও যুক্তির মাধ্যমে।

কিন্তু একথাও ঠিক, তিনি বলেছেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও তাঁর প্রকৃতি তিনি জানেন না। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম আধুনিক বিজ্ঞানের এই বাস্তব প্রকাশেব. কত কাছাকাছি। ◻

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যার প্রকাশ ও লেখক সম্মেলন

গত ৪ অক্টোবর স্বস্তিকার ১৪২৮ পূজা সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ও সেই উপলক্ষ্যে লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার কেশব ভবনের সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কুণাল চট্টোপাধ্যায়, সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক পুলকনারায়ণ ধর। স্বাগত ভাষণে স্বস্তিকার প্রকাশক সারদাপ্রসাদ পাল স্বস্তিকা লেখক গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য, তাঁদের আদর্শনিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে এই কোভিড পরিস্থিতিতেও পত্রিকা প্রকাশ করা যে সম্ভবপর হয়েছে, তা জানান। সম্পাদকের বক্তব্যে ড. তিলকরঞ্জন বেরা অনুষ্ঠানের মূল সুরটি বেঁধে দেন। তাঁর মন্তব্য, লেখক-পাঠকেরা স্বস্তিকা পূজা সংখ্যার প্রকাশ উপলক্ষ্যে এই সম্মেলনের জন্য বছরভর অপেক্ষা করে থাকেন। এবার কোভিড প্রতিকূলতার মধ্যেও তাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন সুসম্পন্ন করতে পারা গিয়েছে। বাস্তবিক এই মহামারী পরিস্থিতিতেও স্বস্তিকা পূজা সংখ্যার প্রকাশ নিয়ে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কুণাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর মূল বক্তব্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অবিচারের জায়গাটি তুলে ধরেন, স্বস্তিকার নির্ভীক কণ্ঠই যে অত্যাচারিত মানুষকে নতুন আশা-ভরসা জোগাচ্ছে, তার উল্লেখ করেন। সেইসঙ্গে অপপ্রচারের বিপক্ষে স্বস্তিকার সত্যানুসন্ধান ও যুক্তিনিষ্ঠারও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সাংবাদিকতায় পশ্চিমবঙ্গের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেন অধ্যাপক পুলকনারায়ণ ধর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় যে শাণিত ব্যঙ্গের অস্তিত্ব ছিল, যা তৎকালীন সমাজের ভুলভ্রান্তি শুধরে নিতে সাহায্য করেছিল, আজকে স্বস্তিকা তার সার্থক উত্তরসূরির দায়িত্ব পালন করছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বস্তিকার লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে শেখর সেনগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ দাস, রামানুজ গোস্বামী, সপ্তর্ষি ঘোষ প্রমুখ মতামত রাখেন। এঁদের বক্তব্যে বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে স্বস্তিকার পৃথক গুরুত্বের কথা উঠে আসে। অনুষ্ঠানের প্রথমে সংস্কার ভারতী তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সন্দীপ চক্রবর্তী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অর্ণব নাগ। ▯

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদার চরিত্রে এখনও ওরা অদ্বিতীয়

রূপশ্রী দত্ত

সারদা-রামকৃষ্ণকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রগুলিকে জীবনীচিত্র বা 'বায়োপিক' বলা যায়। জীবনীচিত্রগুলির আকাঙ্ক্ষিত শর্ত হলো, চরিত্রগুলির আকৃতি ও বাচনভঙ্গীর সঙ্গে ওই ভূমিকায় অভিনেতা- অভিনেত্রীর সাদৃশ্য থাকতে হবে। তবেই তা দর্শকদের কাছে অধিকতর বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে। এ হিসেবে সহধর্মিণী সারদামণি দেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকার অভিনেত্রী ও অভিনেতা হিসেবে যথাক্রমে শ্রীমতী শোভা সেন ও শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্যসাধারণ। এঁরা আরও অনেক ছবিতে অভিনয় করলেও, পরমহংস-বিষয়ক ছবিগুলিতে এঁরা অসামান্য।

শোভা সেন প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন, পরাধীন ভারতের ফরিদপুরে। তিনি বিখ্যাত অভিনেতা উৎপল দত্তের স্ত্রী। তাঁদের একমাত্র সন্তান বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত। তাঁর জন্ম ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ ও মৃত্যু ১৩ আগস্ট, ২০১৭, ৯৩ বছর বয়সে। বেথুন কলেজ থেকে, বি.এ. পাশ করে, গণনাট্য সঙ্ঘে যোগদান করেন। শোভা সেন অভিনীত চলচ্চিত্র ঝড় (১৯৭৯), একদিন প্রতিদিন (১৯৭৯), বৈশাখী মেঘ (১৯৮১), এক আধুরী কাহানী (হিন্দি),(১৯৭২), ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ (১৯৬৬), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৫৭), ১০ এপ্রিল ২০১০ তিনি মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

অনেক অভিনেত্রীই রামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদামণির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কিন্তু শোভা সেন অদ্বিতীয়া। আরেকজন হলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ চরিত্রে এক ও অদ্বিতীয়।

চল্লিশের দশক থেকে ৮০-র দশক পর্যন্ত চিত্র মঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উনিশ শতকের উজ্জ্বল

শোভা সেন *গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়*

আধ্যাত্মিক চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। কালিকা থিয়েটারে 'যুগাবতার' নাটকটি রামকৃষ্ণকেন্দ্রিক। তাঁর অভিনীত ছবি সাধক বামাক্ষ্যাপা (১৯৫৮), জয় মা তারা (১৯৭৮), যুগদেবতা অভিনয় করেছেন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। রানি রাসমণি (১৯৫৫), মহাকবি গিরিশচন্দ্র (১৯৫৫), বীরেশ্বর বিবেকান্দ (১৯৬৪)। যত মত তত পথ (১৯৭৯), সাধক রামপ্রসাদ ভারতের সাধক (১৯৬৫), দেবতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা (১৯৬৭), ত্রিনয়নী মা (১৯৭১)।

পৌরাণিক ছবির রামকৃষ্ণ বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় চরিত্রে তিনি সমধিক সার্থক। আমরা বা আমাদের পূর্বপুরুষ কারোরই রামকৃষ্ণ সারদাকে স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। তাই তাঁদের প্রতিকৃতির অনুরূপ কাউকে চলচ্চিত্রে দেখলে, সেই ভূমিকার অভিনেতা অভিনেত্রীকে সার্থক সংযোজন মনে হয়। ◻

আদিকাবি বাল্মীকি

অনেকদিন আগেকার কথা। এক যুবক অনেক চেষ্টা করেও তার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ চালাতে পারত না। যুবকটির নাম রত্নাকর। অভাবের তাড়না সহ্য করতে না পেরে শেষকালে সে ডাকাতি করতে আরম্ভ করল। কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাকে খুন করতেও সে এতটুকু ভাবত না। ডাকাতির সামগ্রী দিয়ে বাবা, মা, স্ত্রী ও নিজের কোনোরকমে চলে যেত। একদিন দেবর্ষি নারদ সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রত্নাকর তাঁকেও আক্রমণ করলে। নারদ কিন্তু একটুকুও ভয় পেলেন না। তিনি শান্তভাবে বললেন, তুমি কি জান না যে ডাকাতি করা পাপ, আর মানুষ খুন করা মহাপাপ? কেন তুমি এরকমভাবে নিজেকে পাপের ভাগী করছ? দেবর্ষি জানতে চাইলেন, তুমি কি মনে কর যে যারা তোমার উপার্জনের ভাগ নিচ্ছে তারা তোমার পাপেরও ভাগ নেবে? নিশ্চয়ই নেবে— রত্নাকর জবাব দিলে। আমার উপার্জিত ধন তারা ভোগ করছে, নিশ্চই তারা আমার পাপেরও ভাগ নেবে। নারদ বললেন, তুমি বরং তাদের জিজ্ঞেস করে এস।

তখন নারদকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে প্রথমেই সে তার বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আমি কীভাবে তোমাদের খরচ চালাচ্ছি, তুমি নিশ্চয়ই জান? — না, তা আমি জানি না তো, বাবা উত্তর দিল। আমি ডাকাতি করে, মানুষ খুন করে জিনিসপত্র এনে তোমাদের ভারণপোষণ করছি। তুমি কি আমার পাপের ভাগ নেবে? —প্রশ্ন করে রত্নাকর। বাবা উত্তর দিল, আমি তোমার পাপের ভাগ নিতে যাব কেন? তোমার কর্তব্য পিতা-মাতার দেখাশোনা করা। এরপর মা-ও একই উত্তর দিলেন।

এই উত্তর শুনে রত্নাকরের মনে ঝড় উঠল। নারদের কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমেই তাঁর বাঁধন খুলে দিলে। তারপর তাঁর পায়ে পড়ে বললে, প্রভু, আমি মহাপাপী। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। নারদ রত্নাকরের অবস্থা সবই বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, রত্নাকর, তুমি আর ডাকাতি করো না। তোমার পরিবারের সবাই তোমাকে কত ভালোবাসে তা তো তুমি দেখলে! আজ থেকে তুমি ভগবানের নামগান করো। দস্যু উত্তর দিলে, আমি তো কিছুই জানিনে প্রভু। নারদ হাসিমুখে বললেন, তার জন্য তুমি ভেবো না। আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি। নারদ বললেন— তুমি রামনাম জপ করতে থাক। কিন্তু দস্যু রত্নাকরের মুখ দিয়ে রামনাম বেরুলো না। নারদ বললেন, ঠিক আছে, তুমি 'মরা মরা' বলতে থাক। নারদের উপদেশ মতো রত্নাকর সেই বৃক্ষতলে আসন করে বসে 'মরা মরা' বলতে বলতে একসময় তার মুখে 'রাম রাম' এসে গেল। এভাবে ভগবানের নামজপ করতে করতে সে বিভোর হয়ে গেল। নারদ চলে গেলেন। রত্নাকরের শরীর ঘিরে উইপোকা ঢিবি বানিয়ে ফেলল। এসব কিছুই সে জানতে পারল না। এভাবে বহুবছর কেটে গেল।

একদিন নারদের মনে পড়ল তিনি রত্নাকরকে রামনাম জপ করতে বলে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই বনে ফিরে এলেন। এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ মস্ত উইয়ের ঢিবির ভিতর থেকে রামনাম শুনতে পেলেন। মহর্ষি নারদ উইয়ের ঢিবি ভেঙে মধুরকণ্ঠে ডাক দিলেন— ওঠো। রত্নাকর চোখ খুলল। চেয়ে দেখল তার সামনে মহর্ষি নারদ দাঁড়িয়ে। উইঢিবি পরিষ্কার তিনি রত্নাকরকে বের করলেন। পরম ভক্তিভরে সে নারদকে প্রণাম করলে। নারদ বললেন, আর তুমি দস্যু নও। রত্নাকরও নও। তুমি ঋষি, তুমি মহর্ষি। আজ দস্যু রত্নাকরের হলো নবজন্ম। ঈশ্বরের ধ্যানে তুমি এত তন্ময় ছিলে যে তোমার চারিদিক উইঢিবি হয়েছিল, তুমি তা জানতেও পারনি। বল্মীকের ঢিবির মধ্যে বসে তুমি তপস্যা করেছ। তাই আজ থেকে তোমার নাম হলো বাল্মীকি।

দস্যু রত্নাকর চিরতরে বিদায় নিলে। তার জায়গায় হলো মহর্ষি বাল্মীকির আবির্ভাব। বাল্মীকির মুখ থেকে সবার আগে কবিতা বেবিয়েছিল, সেজন্য তাঁকে আদিকবি বলা হয়। একদিন তিনি গঙ্গায় যাচ্ছিলেন স্নান করতে। দেখলেন একটা গাছের ডালে একজোড়া সুন্দর বক মনের আনন্দে খেলা করছে। তাদের দেখে বাল্মীকিরও আনন্দের সীমা রইল না। সে সময় হঠাৎ একটি তির শোঁ শব্দে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি বক আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। অন্য পাখিটি তখন করুণস্বরে চীৎকার করতে করতে আহত পাখিটির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই করুণ দৃশ্য দেখে মহর্ষির মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। পেছনে চেয়ে তিনি দেখলেন এক ব্যাধ তির-ধনুক হাতে ছুটে আসছে পাখিদুটিকে ধরবার জন্য। ব্যাধকে দেখে বাল্মীকির মুখ থেকে আপনা থেকে বেরিয়ে এল— মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।। কবিতাটি উচ্চারণ করেই বাল্মীকির মনে হলো, এ কী, এ আমি কী বললাম! আমি তো এমনভাবে কখনোও কিছু বলিনি!

তখনই তিনি দৈববাণী শুনতে পেলেন, বাল্মীকি, ভয় পেও না। তোমার মুখ দিয়ে আজ যা বেরিয়েছে তার নাম কবিতা। শোকে তোমার অন্তর থেকে বেরিয়েছে বলেই এর নাম শ্লোক। এরকম শ্লোকের দ্বারা তুমি শ্রীরামের কাহিনি বর্ণনা কর, তাতে জগতের কল্যাণ হবে।

সেই দৈববাণী শুনেই আদিকবি জগতের কল্যাণের জন্য রামায়ণ রচনা করলেন।

(শাশ্বত ভারত থেকে)

ভারতের বিপ্লবী

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী

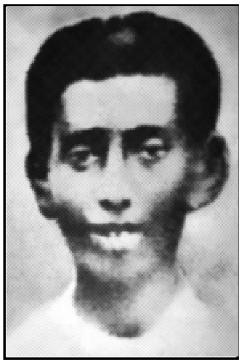

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ১৮৯৪ সালের ৬ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গে মাদারিপুর উপজেলার খালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পঞ্চানন রায়চৌধুরী মাদারিপুর শহরে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। চিত্তপ্রিয় মাদারিপুর হাইস্কুলে ছাত্রাবস্থায় ১৯১০ সালে বিপ্লবী সমিতির সদস্য হন। সেই বছরই ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে পাঁচমাস জেল খাটেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯১৫ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান চলাকালীন কয়েকজন সহকর্মীর সহায়তায় রাস্তায় প্রহররত পুলিশ ইনসপেক্টর সুরেশ মুখার্জিকে গুলি করে হত্যা করেন। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়িবালামের তীরে সম্মুখসমরে পুলিশের গুলিতে বীরগতিপ্রাপ্ত হন।

জানো কি?

- বাংলা বর্ণমালার মোট বর্ণ সংখ্যা ৫০টি।
- স্বরবর্ণ ১১টি — অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।
- ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি — ক খ গ ঘ ঙ/ চ ছ জ ঝ ঞ/ ট ঠ ড ঢ ণ/ ত থ দ ধ ন/ প ফ ব ভ ম/ য র ল/ শ ষ স হ/ ড় ঢ় য়/ ং ঃ ঁ
- পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২টি— অ আ ই ঈ উ ঊ ক ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত দ ন ফ ব ভ ম য র ল ষ স হ ড় ঢ় য়।
- অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮টি — ঋ খ গ ণ থ ধ প শ।

ভালো কথা

বন্ধু লাভ

এবছর দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর দিন আমি দুজন নতুন বন্ধু পেলাম। একজন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শ্রী বিজয় আঢ্য , আর একজন শ্রী সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। ষষ্ঠীর দিন সকালে তাঁরা আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। বাবা বাড়ি না থাকায় আমি তাঁদের সঙ্গ দিই। নানা কথায় তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যেই আমার বন্ধু হয়ে যান। আমি তাঁদের গান, সুভাষিত ও গল্প শুনালাম। সুকেশদা আমাকে সংস্কৃতে কথা বলা শেখালেন। বিজয়দা আমাকে ইংরেজি শেখালেন। বিজয়দা আমাকে মোবাইল ফোনে চিড়িয়াখানা দেখালেন। সিংহ, বাঘ, ঘড়িয়াল, পেলিকান, ময়ুর, হাতি, গণ্ডার, জেব্রা, শিম্পাঞ্জি ও বিভিন্ন ধরনের সাপ দেখলাম। সারাদিন তাঁদের সঙ্গে থেকে খুব আনন্দ পেলাম। তাঁরা বয়সে আমার থেকে অনেক বড়ো হয়েও আমার বন্ধু হয়ে গেলেন।

শ্রেয়াংশু রায়, পঞ্চম শ্রেণী, আগরপাড়া, কলকাতা-৫৮।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ণ জ ল্যা ক	(১) ন হা ভূ স নু তি হী
(২) উ ণ রা ত্ত	(২) তি স মে ক্র র্ব ম্ম স

২৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর	**২৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর**
(১) বিমানঘাঁটি (২) সচরাচর	(১) হর্তাকর্তাবিধাতা (২) বিফলমনোরথ

উত্তরদাতার নাম

(১) ঈশিতা জানা, বড়বাজার(রাজবাটি), পূঃ বর্ধমান। (২) প্রিয়ম সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া (৩) ঋভু জানা, রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর। (৪) অপূর্ব দাস, জুনবেদিয়া, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

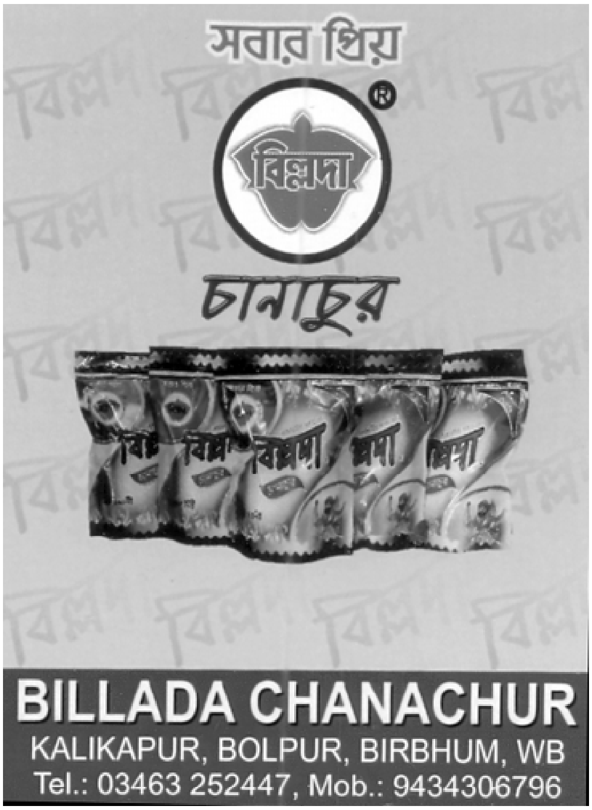

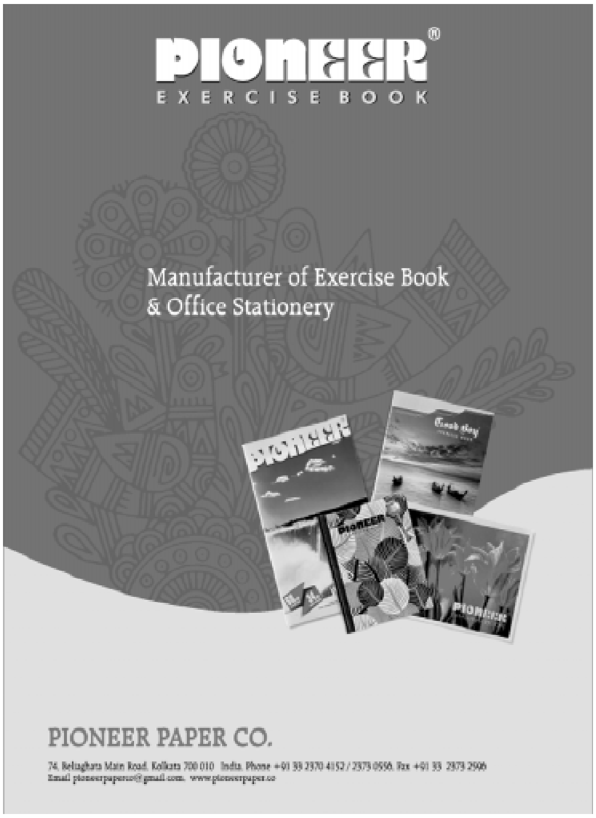

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

আমেরিকা আফগানিস্তানে হারেনি, হেরেছে আফগান জনগণ

শিতাংশু গুহ

আমেরিকা নাকি আফগানিস্তানে হেরেছে, এই অপপ্রচার চলছে এবং এটি করছে তালিবান সমর্থকরা। তালিবানরা একথা বলছে না, কারণ তাঁরা জানে যে, তাঁরা যা করছে তা সবই পূর্বাহ্নে আমেরিকা অনুমোদিত। কেউ হয়তো কাবুল বিমানবন্দরে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ তুলতে পারেন, ওটা আল-কায়দা'র কাজ। যদিও তালিবান, আল-কায়দা ইত্যাকার ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলো ভাই-ভাই, একই আদর্শে লড়ছে, তবু ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এঁরা একে অপরের শত্রু। যেমন এ মুহূর্তে কাবুলে তালিবান ও হাক্কানি গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব স্পষ্ট, এটি সংঘাতের রূপ নিলে আশ্চর্যের কিছু হবে না।

যুদ্ধে আমেরিকাকে হারানো সম্ভব নয়। তবু কেন এই প্রচার? কারণ ইসলামি জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদ চাঙ্গা রাখতে বা উৎসাহিত করতে এর প্রয়োজন আছে। চীন ও কমিউনিস্টরা এই প্রচারের অংশীদার, কারণ ভেঙে পড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা চিন্তাধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে এর বিকল্প নেই! কমিউনিস্ট ও ইসলামিস্টরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ এবং এ সময়ে বড়ো শত্রু আমেরিকার বিরুদ্ধে। এজন্যে চীনের সঙ্গে তালেবানদের সম্পর্ক ভালো। আমেরিকা ও ভারতকে চাপে রাখতে চীন ইসলামি জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক। কমিউনিস্টরা ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদ যদি ইসলামি মৌলবাদ হয়, তাতে তাদের আপত্তি নেই।

কাবুল বিমান বন্দরে সৈন্য প্রত্যাহারকালে অরাজকতা হয়েছে, এজন্যে দায়ী বাইডেন প্রশাসন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সৈন্য প্রত্যাহারের সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন ৬ মাসের মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন এবং পরে ৯/১১, ২০২১ মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সকল সৈন্য ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তালিবানদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ৩১ আগস্ট ২০২১-র সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করেন। এতে পরাজয় এল কোত্থেকে? সদ্য

মার্কিন ড্রোনের আঘাতে আফগানিস্তানে নিরীহ মানুষ মারা গেছে, তালিবানরা প্রতিশোধের কথা বলছে না, 'মিউ মিউ' করে ক্ষতিপূরণ চাইছে।

বাংলাদেশের মিডিয়ার একাংশ তালিবানদের 'যোদ্ধা' বলতে পছন্দ করে। তালিবানরা যোদ্ধা নয়, বরং জঙ্গি-সন্ত্রাসী। বিন লাদেন-কে যাঁরা 'হিরো' ভাবতে পছন্দ করে, তারা মোটামুটিভাবে তালিবান/ মৌলবাদের সমর্থক। মুসলিম বিশ্ব আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য বিদায়ে 'তৃপ্তির হাসি' হাসছে, তাদের এই হাসি মিলিয়ে যেতে খুব বেশি সময় নেবে না। বাইডেন বলেছেন, আফগান জনগণ কোন পথে যাবেন সেটি তাদের দায়িত্ব, আমাদের নয়। কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে, প্রায় আড়াই হাজার মার্কিন প্রাণহানির পর এই উপলব্ধি কষ্টার্জিত সত্য এবং সঠিক, আরও আগে বুঝলে ভালো হতো। আফগানদের 'মানুষ' বানানোর মার্কিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ।

এই তো সেদিন আফগান রমণীরা তালিবানদের বরণ করে নিয়েছিল, এবার বিনা যুদ্ধে তালিবানদের কাবুল দখল কি প্রমাণ করে না যে, আফগানরা প্রায় সবাই 'তালিবান'? পুরো জনগোষ্ঠী যখন জঙ্গিবাদের সমর্থক, আমেরিকার তখন সেখানে সময় ও অর্থ অপচয়ের দরকার কী? কথায় বলে, 'জাতি যেমন তাদের শাসকও তেমন'। আফগানরা ১৪শো বছর আগের যুগে ফিরে যেতে যায়, তাঁদের যেতে দেওয়া হোক। তবে তাদের জানিয়ে দেওয়া ভালো যে, আফগান মাটি যদি আবারও সন্ত্রাস রফতানিতে ব্যবহৃত হয়, তবে ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানচিত্রে 'আফগানিস্তান' বলে কোনো দেশ থাকবে না।

দুই জার্মানি তাঁদের মধ্যেকার দেয়াল ভেঙে ফেলেছে, এজন্যে তাঁদের 'সন্ত্রাসী' হতে হয়নি, জঙ্গি হয়ে নিরপরাধ মানুষের গলা কাটতে হয়নি। কারণ, ওঁরা সভ্য। অনেকে বলেন, তালিবান বা আল-কায়দা আমেরিকার সৃষ্টি। তাঁরা নিজদের প্রশ্ন করুন, আমেরিকা কেন হিন্দু-বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানদের দিয়ে জঙ্গি গ্রুপ তৈরি করতে পারে না? তালিবানরা কোন দেশের যোদ্ধা? তাঁরা কোন দেশ স্বাধীন করেছে? ওদের কৃতিত্ব তো শুধু কাপুরুষের মতো 'আত্মঘাতী' বোমা মেরে মানুষ মারা এবং নারীর ওপর জবরদস্তি প্রতিষ্ঠা। মানুষে-মানুষে বিভেদ, নারী-পুরুষের বৈষম্য ধর্মে-ধর্মে ঘৃণা ও বৈরিতা সৃষ্টি, হত্যা, ধর্ষণ এবং গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে হানাহানি তালিবানদের একমাত্র কৃতিত্ব।

মোল্লা ওমরের কথা মনে আছে? তিনি ছিলেন আফগান প্রতিনিধি। নাজিবুল্লাহ'র করুণ ও বর্বর মৃত্যুই আফগান সভ্যতা। 'বামিয়ান' ধ্বংসে বেশিরভাগ আফগান জনগণের সমর্থন ছিল, অনেকে অংশ নিয়েছিল, এটিই তাঁদের 'ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি'। মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমেরিকা বা রাশিয়া কেউই আফগানিস্তানে হারেনি, হেরেছে আফগান জনগণ। □

ফঃ ৬

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে ক্যানসার রোগের চিকিৎসা

ডাঃ নূপুর বিশ্বাস

আমরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ দূর করতে পারি এবং সবাইকে সুস্থ রাখতে পারি। আয়ুর্বেদ মতে যখন শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ সাম্যাবস্থায় থাকে তখন শরীর সুস্থ থাকে, বায়ু পিত্ত কফ অসাম্য অবস্থায় এলে অথবা এদের বৃদ্ধি হলে বা কমে গেলে শরীরে রোগ উৎপন্ন হয়।

এখনো পর্যন্ত ক্যানসার রোগে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় ক্যানসার রোগ সহজে ধরা পড়ে না, শেষ পর্যায়ে গিয়ে ভালো কোনো চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না। বাস্তবিক অর্থে এখনো ক্যানসারের চিকিৎসায় পুরোপুরি কার্যকর কোনো ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। ক্যানসার বা কর্কটরোগ সারানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। তবে প্রাথমিক অবস্থায় ধরা না পড়লে এই রোগ সারানো সম্ভব নয়। ২০০ প্রকারের বেশি ক্যানসার রয়েছে, প্রত্যেক ক্যানসারই আলাদ আলাদা এবং এদের চিকিৎসা পদ্ধতিও আলাদা। বর্তমানে ক্যানসার নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে নতুন নতুন অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

ক্যানসার নামক রোগ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, যে বায়ু পিত্ত কফের গুণাবলীর সমাগ্রিক ভাবে বিপর্যয়স্বরূপ (alteration of molecular biology) দোষে যে সান্নিপাতিক অবস্থা তৈরি হয় তার ফলস্বরূপ প্রাকৃত কর্মের পরিবর্তে বিকৃতকর্ম পরিদর্শন করে। বিশেষ করে বিকৃত বিষম অবস্থায় সান্নিপাতিক স্তরে ক্যানসার বা কর্কট রোগটি উৎপত্তি হয়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে ক্যানসার অথবা কর্কট রোগের চিকিৎসা পর্যালোচনা :

(ক) **শস্ত্রকর্ম :**

(খ) **বিষপ্রয়োগ :** শোধিত বৎসনাভ, ধুতরা বীজ, কুচিলা বীজ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

(গ) **তপনসন্তাপ :** হীরক ভস্মের প্রয়োগ, সূর্য সন্তাপের ফলে শরীরে উৎপন্ন ভিটামিন-ডি ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। অবশ্যই ক্যানসারে অত্যন্ত সন্তাপ সেবন নিষিদ্ধ।

(ঘ) **মজ্জা প্রয়োগ :**

(ঙ) **রসায়ন প্রয়োগ :** রসায়ন ঔষধি বিশেষত ভল্লাতক রসায়ন, তুবরক রসায়ন, পিপ্পলী রসায়নাদির প্রয়োগ ক্যানসার রোগ বা কর্কট রোগের প্রতিরোধক হিসেবে হিতকর।

(চ) **ব্যাধিগ্রস্তকোষ প্রত্যানিক চিকিৎসা :** শিরিষ, অপমার্গ বীজ, শ্বেত পুনর্ণবা, তাম্র ভস্ম, প্রবাল ভস্ম ও মুক্তা ভস্ম বিভিন্ন অঙ্গের ক্যানসারে হিতকর।

(ছ) **ঔষধি দ্রব্য :** মহাতিক্ত ঘৃত, দ্রাক্ষাসব, কনকাসব, মৃত্যুঞ্জয় রস, অগ্নিতুণ্ডী বটী, এরণ্ড তৈল, গোমূত্র, আরনাল, ত্রিবৃতাবলেহ ইত্যাদি ক্যানসারে বিশেষত রোগীর ব্যাধির বল ও অবস্থা বিবেচনা করে মাত্রাব্য প্রযোজ্য।

(জ) **ডায়েট ম্যানেজমেন্টে শিক্ষা :** আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় মসলা, শাসকসবজি, ফল ইত্যাদি এদের মধ্যে আন্টিঅক্সিডেন্টের বৈশিষ্ট্য আছে, এদের কোষ বিভাজন, কোষের পার্থক্য এবং ইমিউনোক্যাম্পেটিশনে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে। অতএব, এই ভেষজ ও মসলা আমাদের প্রতিরোধের ক্রিয়া বাড়াতে এবং অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য আমাদের প্রতিনিদের খাবারগুলিতে যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন :

হলুদ :

হলুদের অন্যতম প্রধান উপাদান কার্কিউমিন। কার্কিউমিনে হাড়, স্তন, মস্তিষ্কের টিউমার, কোলন, পেট, মূত্রাশয়, যকৃতে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে। কিডনি প্রভৃতিতে প্রদাহ ও সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য কার্যকর অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট হিসেবেও

পরিচিত।

রোজমেরি :

রোজমেরিতে ক্যাফিক অ্যাসিড ও রোজমারিনিক অ্যাসিড রয়েছে। এই উপাদানগুলি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এজেন্ট হিসেবেও কাজ করে। কর্নোসোল নামক আরেকটি উপাদানও রোজমেরিতে উপস্থিত রয়েছে, যা টিউমার গঠনে বাধা দেয়। রোজমেরি ব্রেস্ট ক্যানসার সৃষ্টি করে এমন রাসায়নিকগুলির ডিটক্সিফিকেশনের জন্যও ব্যবহৃত হয়। রোজমেরিতে উপস্থিত টর্পেনগুলি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস করতে সহায়তা করে যা শেষ পর্যন্ত কেমোথেরাপির প্রভাব থেকে স্বাস্থ্যকর টিস্যু রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।

দারুচিনি :

এটি শরীরে নতুন রক্তনালী গঠনে বাধা দিয়ে টিউমার বৃদ্ধি হ্রাস করতে উপযোগী। কোরিয়ার একটি গবেষণা অনুসারে, দারুচিনি নিষ্কাশনে ক্যানসারজনিত কোষগুলির বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

পার্সলে :

পার্সলে থেকে নেওয়া তেল টিউমার গঠনের প্রতিরোধ করতেও দেখা যায়, বিশেষত ফুসফুসে। এটি কোমোপ্রোটেকটিভ খাবার হিসেবে পরিচিত। এটি কার্সিনোজেনের প্রভাবকে নিরপেক্ষ করতে সহায়তা করে। অতিরিক্তভাবে পার্সলেতে অ্যাপিগিন থাকে যা রক্তনালী হ্রাসবৃদ্ধিকে উৎসাহ দেয় যা ক্যানসারযুক্ত টিউমারগুলিকে পুষ্টি সরবরাহ করে।

রসুন :

রসুনে সারফাল, আর্গিনাইন, ফ্ল্যাভোনয়েডস ও সেলেনিয়াম রয়েছে। বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রমাণ করেছে যে রসুন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সম্পর্কিত। এটি ক্যানসার সৃষ্টিকারী এজেন্টগুলির গঠন বা সক্রিয়করণ বন্ধ করার ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল এজেন্ট হিসাবেও কাজ করে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কমপক্ষে ২-৫ গ্রাম বা রসুনের একটি কোয়া গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়।

আদা :

আদাকে বিশ্বের সর্বাধিক কার্যকর ক্যানসার-বিরোধী ভেষজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি গবেষণায় ক্যানসারজনিত কোষগুলিতে আদার প্রভাব অধ্যয়নের জন্য ইঁদুরের ওপর আদা ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি পাওয়া গেছে যে আদা নিষ্কাশন ৫৬ শতাংশ দ্বারা প্রস্টেট ক্যানসার টিউমার সংকুচিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এটিও উপসংহারে পৌঁছেছিল যে আদা একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এজেন্ট। আদাতে প্রধান উপাদান হলো আদা, যা কোলনের ক্যানসারজনিত কোষগুলির বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। এটি ডিম্বাশয়ের ক্যানসার কোষগুলিতে অ্যাপোপটোসিস প্রচারে সহায়তা করে।

তুলসী : ভারতে তুলসী তার শক্তিশালী নিরাময়ের দক্ষতার জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত। এটিতে ফাইটোকেমিক্যালস নামে পরিচিত কিছু উপাদান রয়েছে যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি করে, ক্যানসার কোষকে মেরে ফেলে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ক্যানসার কোষের বিস্তার প্রতিরোধ করে ফুসফুস, যকৃত, মুখগহ্বর ও ত্বকের ক্যানসার প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।

আমলা :

এটি একটি আয়ুর্বেদিক সুপারফুড হিসেব বিবেচিত হয়। এটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং কোরেসেটিন, ফিলাইলম্বিলিক যৌগ, প্যাকটিন, ফ্লাভোনয়েড ইত্যাদি সমন্বিত রয়েছে। আমলাও সাধারণ কোষকে কোনও ক্ষতি না করেই ক্যানসার কোষগুলির আরও বৃদ্ধি ধ্বংস এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেখিয়েছে।

আপেল :

অ্যাপলে পলিফেনল নামে একটি পদার্থ থাকে যার মধ্যে ক্যানসার বিরোধী গুণ বেশি থাকে। পলিফেনলগুলি উদ্ভিদ-ভিত্তিক যৌগগুলি প্রদাহ, নির্দিষ্ট সংক্রমণ এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিয়েছেন যে পলিফেনলগুলিরও অ্যান্ট্যানসার এবং টিউমার-লড়াই করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দেখা গেছে যে পলিফেনল ফ্লোরিটিন গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার এক্সএনইউএমএক্সকে নিষিক্ত করে, যা উন্নত পর্যায়ের ক্যানসার কোষের বৃদ্ধির জন্য দায়ী। এটি স্বাস্থ্যকর কোষগুলিকে প্রভাবিত না করে স্তন ক্যান্সারের কোষগুলির বৃদ্ধিও বাধা দেয়।

সবজি :

ব্রোকলি ও ফুলকপি জাতীয় সবজিগুলিতে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে ইত্যাদির মতো উপকারী উপাদান রয়েছে যা ম্যাঙ্গানিজ ও সালফারের মতো অন্যান্য পুষ্টিতেও ক্যানসার বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গবেষণায় জানা গিয়েছে যে সালফোরাফেন জেনিস্টাইন নামক একটি উপাদানের সঙ্গে মিলিত হলে স্তন ক্যানসারের টিউমার বিকাশ এবং টিউমারের আকার হ্রাস করতে সহায়ক। সালফোরাফেন হিস্টোন ডাইস্টাইটিলেস নামে একটি এনজাইম তৈরি করতে বাধা দিতেও সহায়তা করে যা ক্যানসারের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত।

(ঝ) যোগাসন : যোগাসন ভারতে একটি প্রাচীন অনুশীলন যা ধ্যান, শ্বাস ও অঙ্গভঙ্গির সমন্বয় করে শরীর ও মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। যোগাসন মানসিক চাপ কমাতে, শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং পিঠে ব্যথা কমাতে সহায়ক। যদিও যোগাসন ক্যানসারের চিকিৎসা বা অন্য কোনও দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার সঙ্গে সরকারি যুক্ত করা যায় না। তবে এটি অন্যান্য বেশ কয়েকটি সুবিধা প্রদান করতে পারে যা রোগীর দ্রুত পুনরুদ্ধারে অবদান রাখতে পারে। □

অসমের দিসপুর দখলের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি বঙ্গীয় মুলের মুসলিমদের

রাজু সরখেল

‘দিসপুর দখলের ব্লুপ্রিন্ট বঙ্গীয় মুলের মুসলিমদে’র এবং ‘অসমকে হিন্দু রাজ্য করতে চায় বিজেপি’ শীর্ষক খবর পড়লাম। আমি খুবই দুঃখিত ও উদ্বেলিত। এক, কেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা অসমকে মুসলমান রাজ্য বানাতে চাইছে, দুই, বৃন্দা কারাটের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলতে হয় অসম মুসলমান রাজ্য হলে কী তিনি খুশি হতেন। তিনি এই দেশের খান আর তাবেদারি করেন ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের, যারা রোজ কোথাও না কোথাও হিন্দুদের উপর উগ্র মৌলবাদী আক্রমণ চালাচ্ছেন?

সম্প্রতি, অসমের সিপাঝাড়ের গোরুখুঁটিতে মিঞা মুসলমান অনুপ্রবেশি উচ্ছেদ করা নিয়ে দেশব্যাপী রাজনৈতিক চাপান-উত্তোর শুরু হয়েছে। দেশের কোথাও কোনো রাজ্যে তোলপাড় না হলেও বাঙ্গলায় দফায় দফায় বিক্ষোভ, মিছিল এবং হিমন্তর কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে অবিজেপি দলগুলির পক্ষ থেকে এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে, পথ আটকে প্রতিবাদ হয়েছে। পালঘরে সন্ন্যাসী হত্যা হলে এরা পথে নামেন না। এসব অসত্য, বর্বর, হিন্দুশত্রু বলে পরিচিত বাংলার কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী এবং মতদপুষ্ট দলগুলির জন্য আমার দুঃখ হয়। যেদিন নিজের জীবদ্দশায় দেখবেন চোখের সামনে রোহিঙ্গা বাড়িঘর দখল নিচ্ছে সেদিন হয়তো চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হবে। পঞ্জাবি নেতা হরকিষণ সিংহ সুরিজিৎ কমিউনিস্ট হলেও ধর্মীয় পাগড়ি কিন্তু খোলেননি। আবার চীনা কমিউনিস্টের আদর্শে বিশ্বাসী ভারতের মার্কসবাদী দল জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেননি। তাহলে এদের নীতি ও আদর্শ বলে কিছু আছে কি?

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে এছাড়া রাহুল কংগ্রেস, লালপার্টি, আমরা বাঙ্গালি, এসইউসিআই-সহ আঞ্চলিক দলগুলির রাস্তায় নেমেছে। কিন্তু হিন্দু হয়ে বিতাড়িত হয়ে বা ধর্মান্তরিত হয়ে ওপার বাঙ্গলা থেকে তাড়া খেয়ে এসেও এদের বিন্দুমাত্র লজ্জা ও আফশোস নেই। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা হিন্দুদের কিয়দংশ লালপন্থীর মগজ ধোলাইয়ে ভুলে গেছেন মুসলমানদের দ্বারা বাংলাদেশ ভাগের পর এই পরিবারগুলি কি অত্যাচারিত হয়েছিল? সব ভুলে দুধেল গাইদের রক্ষা করতেই পলিটব্যুরোর নির্দেশ আসরে নেমে পড়েছেন। ওইদিকে দেশ বিভাজনের খলনায়ক নেহরু গান্ধীর পরিবারের যেমন সাপোর্ট রয়েছে কাশ্মীর সীমান্তে অনুপ্রবেশীদের পক্ষে। কংগ্রেস শরিকদের মধ্যে মেহেবুবা মুখতি, আব্দুল্লাহর পরিবার উল্লেখ্য যোগ্য। দেশের আমজনতার করের টাকায় মাগনা খাওয়া মুফতি ও ফারুক-অমররা আজ মোদীর পদক্ষেপে সাইনবোর্ড। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাড়িয়ে দিলে এরা চিন্তিত নন। চীনা কমিউনিস্টের আদর্শে বিশ্বাসী বৃন্দা কারাট মিডিয়াতে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, অসম সরকার কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল, এরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। যখন অসম কংগ্রেস শাসিত গগৈ সরকার ছিল চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে তখন মিঞা মুসলমানদের বাড়বাড়ন্ত দেখেও না দেখার ভান করে কেন ছিলেন? মিঞা মুসলমানরা পাইকারি হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে অসম দখলের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করছেন আর এদের জন্য এত দরদ কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় দলের যে রাস্তায় নামতে হয়। আসলে এসব দিল্লির মসনদ দখলের ধান্ধা। যদি দেশের প্রতি ডান বমের দায়বদ্ধতা থাকত তাহলে উস্কানিমূলক মন্তব্য করতেন না কারাট মহেদয়া। প্রতিবাদ করে পথে নেমেছেন অসমের ভিএইচপি-সহ অন্যান্য হিন্দু সংগঠন।

প্রসঙ্গত, মুসলমানদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির পিছনে যে যুক্তি দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা তা সবই সত্য। অনেক হয়েছে এখন কঠোর হাতে এনআরসি চালু করে দমন করতেই হবে। নইলে সনাতনী ধর্মকে রক্ষা করা যাবে না। যুগ যুগ ধরে চলে আসা হিন্দু সনাতন ধর্মের উপর বড়োসড়ো আঘাত হানতে উগ্র মৌলবাদী মুসলমান সংগঠন। আমরা দেখলাম কীভাবে আফগানিস্তান দখল করে নিল কট্টোর মৌলবাদী তালিবানীরা। শিয়া সুন্নির লড়াই চলছে সারা বিশ্বজুড়ে। আর মুসলমান দেশগুলি অনুপ্রবেশি মুসলমাদের আশ্রয় দেয় না। সেখানে ভারত দেশ কি করে ওই রেহিঙ্গাদের আশ্রয় দেবে। এই দেশ ধর্মশালা নয়। বিগত বছরে পালঘরে তিনজন সন্ন্যাসীকে হত্যা করা হলে বৃন্দা কারাট মিডিয়াতে কোনো মন্তব্য দেননি তেমনি জোর করে হিন্দু ধর্মান্তকরণ হলে, হিন্দু নারীদের উপর নির্যাতন হলে, ধর্ষণ, জমিজমা কেড়ে নেওয়া চলছে বৃন্দা কারাটের চোখে পড়ে না। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার হিম্মতওয়ালা বটে যে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারতমাতার সুযোগ্য সন্তান। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে অনুপ্রবেশে অসমের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্টই। অসমীয়া আর হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ❑

ভারতে সমাজতন্ত্রের দুই পথিকৃৎ

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ

ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া

ভারতবর্ষের এই পবিত্র ভূমিতে শুধুমাত্র মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জন্মগ্রহণই করেছেন এমন নয়, বরং এমন অনেক স্বাধীনতা যোদ্ধা ছিলেন যারা স্বাধীনতার পর ক্ষমতার মায়া ত্যাগ করে নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া—এই দু'জন মহৎ মানুষ হলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জরুরি অবস্থার সময় জেপি সম্পূর্ণ বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিলেন, অপরদিকে লোহিয়া তাঁর ক্ষুরধার প্রশ্ন তুলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে স্তম্ভিত করেছিলেন।

যখনই আমরা জয়প্রকাশ নারায়ণের কথা ভাবি, তখনই দিল্লির রামলীলা ময়দানের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেখান থেকেই তিনি জনগণকে সম্পূর্ণ বিপ্লবের পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন। জয়প্রকাশ ১৯০২ সালের ১১ অক্টোবর বিহারের সারানের সিতাবদিয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা দেবকীবাবু এবং মা ফুলরানি দেবী। ১৯২০ সালে প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে জেপি-র বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁর জীবনে প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হয় ১৯২৩ সালে যখন তিনি পড়াশোনা করতে ক্যালিফোর্নিয়া যান। ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকার সময়, তিনি দৈনন্দিন খরচ মেটাতে ওয়েটার হিসেবেও কাজ করতেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশোনার খরচ দ্বিগুণ করা হলে তিনি আইওয়াতে চলে যান, সেখানে খরচ তুলনামূলক ভাবে কম ছিল। তিনি আমেরিকায় সাত বছর পড়াশোনা করেন।

এই সময়ে তিনি পচাফল বাছাই, কসাইখানায় কাজ, বাড়িতে বাড়িতে ক্রিম ও

ভারতবর্ষের এই পবিত্র ভূমিতে শুধুমাত্র মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জন্মগ্রহণই করেছেন এমন নয়, বরং এমন অনেক স্বাধীনতা যোদ্ধা ছিলেন যারা স্বাধীনতার পর ক্ষমতার মায়া ত্যাগ করে নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া— এই দু'জন মহৎ মানুষ হলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্যাম্পু বিক্রির মতো কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯২৯ সালে দেশে ফিরে তিনি সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে মাদ্রাজে ব্রিটিশ সরকার যখন জয়প্রকাশকে প্রথম গ্রেপ্তার করে, তখন মুম্বইয়ের ইংরেজি সংবাদপত্র 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' লিখেছিল 'ব্রেন অব দ্য কংগ্রেস' গ্রেপ্তার হয়েছে। আচার্য নরেন্দ্র দেব, ড. রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন, ইউসুফ মেহরালি, মিনু মাসানি, এস এম যোশী এবং অন্যান্য অনেক নেতার সঙ্গে মিলে তিনি ১৯৩৪ সালে পাটনায় কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেন। ১৯৪২ সালের ৮ নভেম্বর দীপাবলীর দিন থেকে জয়প্রকাশ ও তাঁর সঙ্গী সালিগ্রাম সিংহ, যোগেন্দ্র শুক্লা, সূর্যনারায়ণ সিংহ, রামানন্দন মিশ্র ও গুলাব চন্দ্র গুপ্ত ওরফে গুলালী সেনানার সঙ্গে হাজারিবাগ কারাগারের প্রাচীর টপকে পালিয়ে যান। জেল থেকে পালিয়ে যাওয়া বিপ্লবীদের ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। জয়প্রকাশ ১৯৪৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে লাহোর কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর উপর চূড়ান্ত নির্যাতন করা হয়। পরে তাঁকে আগ্রা কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব করেছিল, এরপর ১৯৪৫ সালের জুন মাসে সমস্ত বিপ্লবীকে মুক্তি দেওয়া হয়। গান্ধীজী তখন ব্রিটিশদের জানিয়েছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রামমনোহর লোহিয়াকে মুক্তি দেওয়া হবে না, ততক্ষণ স্বাধীনতার বিষয়ে তিনি কোনও কথা বলবেন না। অবশেষে, ৩১ মাস পরে ১৯৪৬ সালের ১১ এপ্রিল জয়প্রকাশ জেল

থেকে মুক্তি পান।

১৯৫৩ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জয়প্রকাশকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান কিন্তু জয়প্রকাশ তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনে যোগদান করতে সক্রিয় রাজনীতি পরিত্যাগ করেন। কথিত যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর জয়প্রকাশকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি আবার তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬৭ সালে ড. রামমনোহর লোহিয়া ও মিনু মাসানি রাষ্ট্রপতির পদের জন্য জেপির নাম প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি পদে ড. জাকির হুসেনের নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৭৪ সালে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জের পর, জয়প্রকাশ বিহার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তার মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। ইলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক রায়বরেলি আসন থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে 'অকার্যকর ও বাতিল' ঘোষণা করার পর ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন জয়প্রকাশের নেতৃত্বে দিল্লির রামলীলা ময়দানে একটি বিশাল ইন্দিরা বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জয়প্রকাশ নিজের ক্ষমতাগুণে সমস্ত বিরোধী দলকে একত্রিত করেছিলেন। এই সমাবেশে জয়প্রকাশ 'সম্পূর্ণ বিপ্লবে'র ডাক দেন। 'সিংহাসন ছেড়ে দিন' স্লোগানে সমবেত জনতা ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে বলেন। ফলে সমগ্র দেশে মধ্যরাতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া প্রথম নেতাদের মধ্যে ছিলেন জয়প্রকাশ। অবশেষে ১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং জয়প্রকাশ আবার জনগণের নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। দেশে যখন প্রথমবার অ-কংগ্রেসি সরকার গঠিত হয়, তখন জয়প্রকাশ মোরারজী দেশাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বরণ করেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণের জীবন কাহিনি আমাদের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক, কারণ তিনি মানুষের স্বাধীনতাকে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন সমাজ নির্মাণের সূচনা করেছিলেন। দীর্ঘদিন কিডনি রোগে ভুগেছিলেন, শেষপর্যন্ত ১৯৭৯ সালের ৮ অক্টোবর তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর অবদানের প্রতি সম্মান জানাতে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার ১৯৮৮ সালে তাঁকে ভারতরত্ন পুরস্কারে ভূষিত করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্য এক যুগপুরুষ ড. রামমনোহর লোহিয়া। জেনিভায় ১৯৩০ সালে জাতি সঙ্ঘের অধিবেশন চলছিল। ভারতের ব্রিটিশ সরকার বিকানিরের মহারাজাকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনীত করেছিল। মহারাজা যখন কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, সেই সময় দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত এক যুবক জোরে শিস দিয়ে ওঠে, স্বাভাবিকভাবে সেখানে উপস্থিত সকলে তাঁর দিকে ঘুরে তাকালেন। যুবকটি বলল, মহারাজা ভারতের মানুষের প্রতিনিধি নন বরং তিনি আসলে ব্রিটিশদের বন্ধু। অধিবেশনের সভাপতি যুবকটিকে সভা থেকে বহিষ্কার করে দেন। এই যুবকটি আসলে ছিলেন ড. রাম মনোহর লোহিয়া। জেনিভায় এই ঘটনা ভারতে তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে তোলে।

ড. রামমনোহর লোহিয়া ১৯১০ সালের ২৩ মার্চ উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার আকবরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হীরালাল মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী ছিলেন। ভগৎ সিংহের ফাঁসি যেহেতু ২৩ মার্চ হয়েছিল তাই লোহিয়া কখনও তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন করেননি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা আকবরপুরে সমাপ্ত করেন এবং তারপরে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তৎকালীন বোম্বেতে চলে যান। অর্থনীতিতে পিএইচডি করার জন্য লোহিয়া ১৯৩২ সালে বার্লিনে যান। এখানে তিনি তাঁর গবেষণা নির্দেশক হিসেবে অধ্যাপক বার্নার জোমবার্টকে বেছে নিয়েছিলেন। লোহিয়া যখন অধ্যাপক জোমবার্টের সঙ্গে দেখা করলেন তখন তিনি ইংরেজি ভাষায় তাঁর চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন। অধ্যাপক হেসে জার্মান ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি ইংরেজি ভাষা জানেন না। এই ঘটনায় মাতৃভাষাকে সম্মান ও মূল্য দেওয়ার প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করেন যা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলেন। জোমবার্টের কাছে তিন মাস পর ফেরার আশ্বাস দিয়ে লোহিয়া চলে যান। এই তিন মাসে তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে জার্মান ভাষা শেখেন। এর পরে তিনি পিএইচডি সম্পন্ন করতে অধ্যাপক জোমবার্টের কাছে পুনরায় যান। গষেণা শেষ করার পর সমুদ্রপথে তিনি যখন মাদ্রাজে ফিরে আসছিলেন, সেই সময় তাঁর জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর জাহাজ থেকে নেমে তিনি হিন্দু সংবাদপত্রের অফিসে পৌঁছান। তিনি হিন্দু সংবাদপত্রের জন্য দুটি প্রবন্ধ লেখার জন্য ২৫ টাকা পেয়েছিলেন, সেই অর্থ দিয়ে তিনি কলকাতায় মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মালব্যের সঙ্গে একত্রে তিনি রামেশ্বর দাস বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি লোহিয়াকে একটি সংস্থায় সচিবের চাকরির প্রস্তাব দেন কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। জয়প্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেন। ১৯৩৬ সালে যখন তাঁকে কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগের সচিব করা হয়, তখন তিনি ভারতের পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সরকারবিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ১৯৩৯ সালে প্রথমবার লোহিয়াকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় লোহিয়া একটি ভূগর্ভস্থ রেডিয়ো স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৯৪৬ সালের ১৫ জুন তিনি গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য লোহিয়াকে প্রায় পঁচিশবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল। তাই ১৯৪৮ সালে, লোহিয়া তাঁর সমাজতান্ত্রিক দলকে কংগ্রেসের থেকে পৃথক করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেন। ১৯৬২ সালে লোকসভা নির্বাচনে জওহরলাল নেহরুর পুরনো আসন ফুলপুর থেকে লোহিয়া তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু নির্বাচনে হেরে যান। ১৯৬৩ সালে ফরুখাবাদ থেকে উপনির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর লোহিয়া যখন প্রথমবার সংসদে পৌঁছান, তখন তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৯৬৩ সালের ২১ আগস্ট লোকসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় নাগরিকদের অবস্থার উপর আলোকপাত করে তিনি বলেছিলেন যে পরিকল্পনা কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ জনসংখ্যার ২৭ কোটি নাগরিক প্রতি দিন পিছু তিন আনা খরচ করতে সমর্থ। একজন কৃষি শ্রমিক দিনে ১২ আনা আয় করেন, একজন শিক্ষক দুই টাকা আয় করেন। একই সময়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কুকুরের খরচের জন্য প্রতিদিন তিন টাকা খরচ নির্ধারিত রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রতিদিন ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচ হয়। প্রস্টেট অপারেশনের জন্য ১৯৬৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর লোহিয়াকে নয়াদিল্লির উইলিংডন হাসপাতালে (বর্তমানে রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতাল) ভর্তি করা হয়, সেখানেই ১৯৬৭ সালের ১২ অক্টোবর ৫৭ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের সৌজন্যে)

মা সি ক রা শি ফ ল

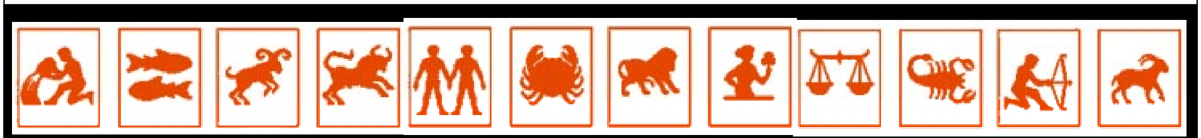

অধ্যাপক অমিত শাস্ত্রী

নভেম্বর

মেষ : কর্মে পরিবর্তন, ব্যবসায়ে লোকসান, মানসিক উদ্বেগ, দাম্পত্য জীবনে কলহ, ধর্মভাব প্রবণ, ভ্রমণে আনন্দ, উন্নতির পথে বাধা।

বৃষ : ফাটকার প্রবণতা, সন্তানের ব্যাপারে মনোকষ্ট, আশাভঙ্গ, শারীরিক কষ্ট, দাম্পত্য কলহ, ব্যবসায়ে ক্ষতি।

মিথুন : গৃহসজ্জায় পরিবর্তন, কর্মে অবনতি দুশ্চিন্তা, দাম্পত্য সুখ, বিবাদে জয়লাভ, সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা।

কর্কট : পৈতৃক সম্পত্তির ক্ষতি, শিক্ষায় বাধা, আকস্মিক ঝামেলা, ছোটোখাটো ভ্রমণ, ব্যবসা বৃদ্ধি, জীবনী শক্তির হ্রাস, পিতার অসুস্থতা।

সিংহ : অত্যধিক খরচ, আশানুরূপ ফল না পাওয়া, দাম্পত্য অশান্তি, প্রণয়ে উন্নতি, উচ্চশিক্ষায় উন্নতি, সন্তান সুখ, মানসিক সামঞ্জস্যের অভাব, কর্মে বদলি, ভাই-বোন হতে মনোকষ্ট।

কন্যা : যে কোনো বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্তি, অর্থের ব্যয়, শিক্ষায় উন্নতি, মায়ের শারীরিক উন্নতি, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি, বিবাহে বাধা।

তুলা : শারীরিক অসুস্থতা ও স্বাস্থ্যহানি, আর্থিক কষ্ট, হটকারিতা, ভ্রমণ হতে পারে, কঠিন পরিশ্রম করে আশানুরূপ ফল না পাওয়া।

বৃশ্চিক : স্বাস্থ্যের অবনতি, ব্যবসায়ে উন্নতি, মিথ্যা অপবাদ, আর্থিক উন্নতি, সন্তানকে নিয়ে চিন্তা, নীচ ব্যক্তির সাহায্যে লাভ।

ধনু : বিপদ থেকে উদ্ধার, শারীরিক অসুস্থতা, ব্যবসায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মস্থানে উঠাপড়ার মধ্যে অগ্রগতি, প্রতিষ্ঠা লাভ, পারিবারিক দায়িত্ব পালন, সন্তানের ব্যাপারে অশান্তি।

মকর : ভ্রমণে বাধা, আত্মীয় বিরোধ, পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি, কর্মক্ষেত্রে বদনাম, শত্রুতা, ব্যবসায়ে বন্ধুর দ্বারা উপকার।

কুম্ভ : বন্ধুর সাহায্যে উন্নতি তবে সাফল্যে বাধা প্রাপ্ত হতে পারে, সন্তান সুখ, প্রতিষ্ঠা লাভ, অপরের ক্ষতি থেকে লাভ, পিতার সঙ্গে মতানৈক্য।

মীন : মনোকষ্ট, উন্নতিতে বাধা, ব্যবসায়ে ঝামেলার মধ্যে অগ্রগতি, সম্মান বৃদ্ধি, উন্নতি, মানসিক উদ্বেগ, মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি, চোখ বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা।

আগামী সপ্তাহে বিবিধ অনুষ্ঠান ও ব্রত

১১ কার্তিক, ৯ নভেম্বর— ষটপঞ্চমী ব্রত এবং জ্ঞানপঞ্চমী ব্রত (জৈন)।

১৩ কার্তিক, ১০ নভেম্বর— শ্রীশ্রী ছটপূজা, লাচিত দিবস (অসম), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবস, কানাইলাল দত্তের আত্মবলিদান দিবস।

২৪ কার্তিক, ১১ নভেম্বর— কলকাতা উৎসব (বিহার), শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু ও শ্রীদাস গঙ্গাধরের তিরোভাবোৎসব, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিবস।

২৫ কার্তিক, ১২ নভেম্বর— শ্রীপাট মুলুকগ্রামে শ্রীশ্রী রামকানাই ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউর উৎসব ও মেলা। ওয়ারিয়া গ্রামে গোপাষ্টমী মেলা ও গো-প্রদর্শনী।

২৬ কার্তিক, ১৩ নভেম্বর— বৃহন্নীল তন্ত্রোক্ত শ্রীশ্রী ত্রিপুরান্দরী দেবীর পূজা শ্রীশ্রীহংস ভগবান ও শ্রীশ্রী সনকাদি ভগবানের আবির্ভাব, জগদ্ধাত্রী পূজা।

২৭ কার্তিক, ১৪ নভেম্বর— পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস এবং আন্তর্জাতিক শিশু দিবস।

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১২।।